বনফুলের গল্প

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিমচাটুজ্জে ষ্ট্রীট.
কলিকাতা—১২



দ্বিতীয় সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২
তৃতীয় সংস্করণ, ভাদ্র, ১৩৫৫
প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা—১২
প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা—
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
মুদ্রাকর—শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
মানসী প্রেস,
৭৩, মাণিকতলা স্ট্রীট
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

দুই টাকা

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

আমার গল্প যাঁহারা ভালবাসেন তাঁহাদের কাছে আমার লেখা সম্বন্ধে ভূমিকা নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা ভালবাসেন না তাঁহাদের কাছে আরও নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা আমার লেখার সহিত পরিচিত নহেন তাঁহারা গল্পগুলি পড়িলেই আমার স্বরূপ জানিতে পারিবেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্যেও আমার বিশেষ কোন নিবেদন নাই।

এই সম্পর্কে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি। আগার পরম বন্ধু 'শনিবারের চিঠি'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামীর নিকট আমি কৃতজ্ঞ। তাহার উৎসাহ এবং আগ্রহ না থাকিলে হয়ত আমি অধিকাংশ গল্পই লিখিতাম না।

শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় এবং শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহায়তায় আমার গল্পগুলি পুস্তাকাকারে প্রকাশিত হইল।

ইঁহাদিগকেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

"বনফুল"

ভাগলপুর

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বেমানান বলিয়া তিনটি বড় গল্প এই সংগ্রহ হইতে বাদ দিলাম। ইতি—

গ্রন্থকার

ভাগলপুর

১৪.৩.৪৫

সূচীপত্র

বাড়তি মাশুল

একেই বলে বিড়ম্বনা।

আমি একজন ডেলি প্যাসেঞ্জার। সেদিন সমস্ত দিন আফিসে কলম পিষে ঊর্দ্ধশ্বাসে হাওড়ায় এসে লোকাল ট্রেণের একখানি থার্ড ক্লাসে বসে হাঁপাচ্ছি—এমন সময় দেখি সামনের প্লাটফর্ম থেকে বোম্বে মেল ছাড়ছে, আর তারই একটি কামরায় এমন একখানি মুখ আমার চোখে পড়ে গেল যাতে আমার সমস্ত বুক আশা আনন্দে দুলে উঠল।

বহুদিন আগে আমার এক ছেলে তারকেশ্বরে মেলা দেখতে গিয়ে ভীড়ে কোথায় হারিয়ে যায়—আর ফেরে নি। অনেক খোঁজ-খবর করেছিলাম, কিছুতেই কিছু হয় নি। ভগবানের ইচ্ছা বলে মনকে প্রবোধ দিয়েছিলাম। আজ হঠাৎ তারই মুখখানি—হাঁা, ঠিক সেই মুখটিই বোম্বে মেলের একটা কামরায় দেখতে পেলাম।

আর কি থাকতে পারি?

তাড়াতাড়ি গিয়ে বোম্বে মেলে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে মেলও ছেড়ে দিলে। ট্রেণে উঠে আবার ভাল করে দেখলাম—হ্যাঁ, ঠিক সেই—পাশে একটি বৃদ্ধও বসে আছেন।

ভয়ে ভয়ে রুদ্ধ নিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলাম "এতদিন কোথায় ছিলি—আমাকে চিনতে পারিস্?"

হা ঈশ্বর—সে উত্তর দিল্ হিন্দীতে। "হামারা নাম পুঁছতে হেঁ?

কেঁও? হামারা নাম মহাদেও মিসর, ঘর ছাপরা জিলা।" সমস্ত মনটা ভেঙ্গে গেল—মনে হল যেন আমি দ্বিতীয়বার পুত্রহারা হলাম।

বৃদ্ধটি বললেন—"হামারা লেড়কা হ্যায় বাবুজি, আপ কেয়া মাঙ্‌তে হেঁ।"

রুদ্ধকণ্ঠে বলিলাম—"কিছু না।"

বেহারী ছাপরাবাসী পিতাপুত্রকে বিস্মিত করে দু-ফোঁটা চোখের জলও আমার শুষ্ক শীর্ণ গালের উপর গড়িয়ে পড়ল।

বর্দ্ধমানে নামলাম।

আবার Excess fare—বাড়তি মাশুল দিতে হল।

চোখ গেল

সাধারণের চোখে হয়ত সে সুশ্রী ছিল না।

আমিও তাকে যে খুব সুন্দরী মনে করিতাম তাহা নহে—কিন্তু তাহাকে ভালবাসিতাম। তাহার চোখ দুটিতে যে কি ছিল তাহা জানি না। তেমন স্বপ্নময় সুন্দর চোখ জীবনে কখনও দেখি নাই। দুষ্টু বলিয়াও তাহার অখ্যাতি ছিল।

সেই কুরূপা এবং চঞ্চলা মিনি আমার চিত্ত-হরণ করিয়াছিল। তাহার চোখ দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

মনে আছে তাহাকে একদিন নিভৃতে আদর করিয়া বলিয়াছিলাম, —"ইচ্ছে করে তোমার চোখ দুটো কেড়ে রাখি।"

"কেন?"

"ওই দুটোই ত আমাকে পাগল করেছে। আমি সব চেয়ে ওই দুটোকেই ভালবাসি।"

এত ভালবাসিতাম—কিন্তু তবু তাহাকে পাই নাই।

অজ্ঞাত অপরিচিত আর একজন আসিয়া বাজনা বাজাইয়া সমারোহ করিয়া তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল।

প্রাণে বড় বাজিল।

কিন্তু সে বেদনা হয়ত মুছিয়া যাইত যদি সঙ্গে সঙ্গে আর একটা মর্ম্মান্তিক ঘটনা না ঘটিত।

মিনি যখন বাপের বাড়ী আসিল, দেখি, তাহার দুটি চক্ষুই অন্ধ। কারণ শোনা গেল যে চোখে গোলাপ জল দিতে গিয়া সে ভুলক্রমে আর একটা ঔষধ দিয়া ফেলিয়াছে।

আমার সঙ্গে আড়ালে একদিন দেখা হইয়াছিল।

বলিলাম—"অসাবধানতার জন্যে অমন দুটি চোখ গেল।"

সে উত্তর দিল—"কেন যে গেল তা যদি না বুঝতে পেরে থাক তাহলে না জানাই ভাল।"

অমলা

অমলাকে আজ দেখতে আস্‌বে। পাত্রের নাম অরুণ। নাম শুনেই অমলার বুকটিতে যেন অরুণ আভা ছড়িয়ে গেল। কল্পনায় সে কত ছবিই না আঁক্‌লে। সুন্দর, সুশ্রী, যুবা—বলিষ্ঠ, মাথায় টেরি, গায়ে পাঞ্জাবী—সুন্দর সুপুরুষ।

অরুণের ভাই বরুণ তাকে দেখতে এল। সে তাকে আড়াল থেকে দেখে ভাব্‌লে—'আমার ঠাকুর-পো।'

মেয়ে দেখা হয়ে গেল। মেয়ে পছন্দ হয়েছে। একথা শুনে অমলার আর আনন্দের সীমা নেই। সে রাত্রে স্বপ্নই দেখলে।

বিয়ে কিন্তু হল না—দরে বন্‌ল না।

২

আবার কিছুদিন পরে অমলাকে দেখতে এল। এবার পাত্র স্বয়ং। নাম হেমচন্দ্র। এবার অমলা লুকিয়ে আড়াল থেকে দেখলে; বেশ শান্ত সুন্দর চেহারা—ধপ্‌ধপে রঙ্‌—কোঁকড়া চুল—সোনার চশমা—দিব্যি দেখতে।

আবার অমলার মন ধীরে ধীরে এই নবীন আগন্তুকের দিকে এগিয়ে গেল।

ভাবলে—কত কি ভাবলে!

এবার দরে বন্‌ল—কিন্তু মেয়ে পছন্দ হল না!

৩

অবশেষে মেয়েও পছন্দ হল—দরেও বন্‌ল—বিয়েও হল। পাত্র বিশ্বেশ্বর বাবু। মোটা কালো গোলগাল হৃষ্টপুষ্ট ভদ্রলোক—বি, এ পাশ—সদাগরি অপিসে চাক্‌রী করেন।

অমলার সঙ্গে যখন তাঁর শুভদৃষ্টি হল—তখন কি জানি কেমন একটা মায়ায় অমলার সারা বুক ভরে গেল। এই শান্ত শিষ্ট নিরীহ স্বামী পেয়ে অমলা মুগ্ধ হ'ল।

অমলা সুখেই আছে।

খেঁদি

তখন সবে সন্ধ্যা।—মালতী ঘরে এসে প্রদীপটা জ্বালতেই তার স্বামী বলে উঠ্‌ল—"লতি···আমি একটা নাম ঠিক করেছি।"

"কি?"

"ওই যে তুমি বল্লে—'কি'।"

"তার মানে?"

"ইংরিজি Key মানে চাবি, আর বাঙলা 'কি'—একটা প্রশ্ন। মেয়ে মানুষের পক্ষে বেশ মানান সই নাম হবে।"

"এখন কোথায় কি তার ঠিক নেই—এখন থেকেই নামকরণ! আর আমার মেয়েই হবে তুমি জান্‌লে কি করে? ও জ্যোতিষীর কথায় আমার একটুও বিশ্বাস নেই।"

"না—না ঠিক মেয়ে হবে—দেখো তুমি। আমাদের শ্যামবাবু জাগ্রত জ্যোতিষী।"

"ধর যদি মেয়েই হয়—তা বলে ওই নাম রাখতে হবে? কত সব ভাল নাম আছে—"

"যথা—শরৎশশী, নিভাননী, ইন্দুবালা, প্রভা, প্রতিভা, সুধা, আশালতা—এই সব ত? সব বাজে—পুরোণো, সেকেলে, এক ঘেয়ে। আমার মেয়ের নাম হবে একেবারে নতুন।"

* * * *
* * * *

মালতীর প্রসব হবার দুমাস পূর্ব্বে তার স্বামী কলেরায় মারা গেল। প্রসব হতে গিয়ে মালতীও মারা গেল। জ্যোতিষীর কথা ফলেছিল—মালতীর মেয়েই হয়েছিল। সে এখন তার মামার বাড়ী সোণারপুরে মানুষ হচ্ছে। তাঁরা তার নাম রেখেছেন "খেঁদি।"

"ও কি তোমাদের মত উপায় ক'রে খাবে নাকি ?

"উপায় ক'রে না খাক—তা'ব'লে মাছ দুধ চুরি ক'রে খাওয়াটা—"

"আমার ভাগের মাছ দুধ আমি ওকে খাওয়াব ।"

"সে ত খাওয়াচ্ছই—তা'ছাড়াও সে চুরি করে। এ রকম রোজ রোজ—"

"বাড়িয়ে বলা কেমন তোমার স্বভাব। রোজ রোজ খায় ?"

"যাই হোক্—আমি বেরালকে মাছ দুধ গেলাতে পারব না। পয়সা আমার এত সস্তা নয়।"

এই বলিয়া ক্রুদ্ধ বিনোদ সমীপবর্ত্তিনী মেনি মার্জ্জারীকে লক্ষ্য করিয়া চটিজুতা ছুঁড়িল। মেনি একটি ক্ষুদ্র লম্ফ দিয়া মারটা এড়াইয়া বাহিরে চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী পারুলবালাও চক্ষে আঁচল দিয়া উঠিয়া গেলেন। বিনোদ খানিকক্ষণ গুম্ হইয়া রহিল। কতক্ষণ আর থাকা যায় ? অবশেষে তাহাকেও উঠিতে হইল। সে আসিয়া দেখে পশ্চিম বারান্দায় মাদুর পাতিয়া অভিমানে পারুলবালা ভূমি-শয্যা লইয়াছেন।

বিনোদ জিনিসটা লঘু করিয়া দিবার প্রয়াসে একটু হাসিয়া বলিল—"কি কর্‌ছ ছেলেমানুষি! আমি কি সত্যি সত্যি তোমার বেরাল তাড়িয়ে দিচ্ছি!"

পারুল নিরুত্তর।

বিনোদ আবার কহিল—"চল চল—তোমার বেরালকে মাছ দুধই খাওয়ান যাক্।"

পারুল—"হ্যাঁ, সে তোমার মাছ দুধ খাওয়ার জন্যে ব'সে আছে

কি না ? তাড়াবেই যদি, এই অন্ধকার রাত্রে না তাড়ালে চলছিল না ?”

“আচ্ছা আমি খুঁজে আন্‌ছি তাকে—কোথায় আর যাবে ?”

বিনোদ লণ্ঠন হাতে বাহির হইয়া গেল। এদিক ওদিক রাস্তা ঘাট জামগাছতলা প্রভৃতি চারিদিক খুঁজিল, কিন্তু মেনির দেখা পাইল না। নিরাশ হইয়া অবশেষে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—পারুল ঠিক তেমনি ভাবেই শুইয়া আছে।

“কই দেখ্‌তে পেলাম না ত বাইরে। সে আস্‌বে ঠিক। চল, ভাত খাইগে চল।”

“চল, তোমাকে ভাত দিই, আমার আজ ক্ষিদে নেই।”

“Hunger strike—করবে না কি !”

পারুল আসিয়া রান্নাঘরে যাহা দেখিল—তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই :—কড়ায় একটুও দুধ নাই—ভাজামাছগুলি অন্তর্হিত—ডালের বাটিটা উল্টান।

এই বিসদৃশ ব্যাপার দেখিয়া পারুল ত অপ্রস্তুত।

বিনোদ এ-সম্বন্ধে আর আলোচনা করা নিরাপদ নয় ভাবিয়া যাহা পাইল খাইতে বসিয়া গেল।

পারুলবালাও খাইলেন।

উভয়ে শুইতে গিয়া দেখে মেনি কুণ্ডলী পাকাইয়া আরাম করিয়া তাহাদের বিছানায় ঘুমাইতেছে।

আত্ম-পর

সারা সকালটা খেটেখুটে দুপুর বেলায় দক্ষিণ দিকের বারান্দায় একটা বিছানা পেতে একটু শুয়েছি। তন্দ্রাটি যেই এসেছে—অমনি মুখের উপর থপ্ করে' কি একটা পড়ল। তাড়াতাড়ি উঠে দেখি একটা কদাকার কুৎসিত পাখীর ছানা। লোম নেই—ডানা নেই—কিম্ভূতকিমাকার। রাগে ও ঘৃণায় সেটাকে উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। কাছেই একটা বেড়াল যেন অপেক্ষা করছিল—টপ্ করে মুখে করে নিয়ে গেল। শালিক পাখীদের আর্ত্তরব শোনা যেতে লাগল।

আমি এপাশ ওপাশ করে আবার ঘুমিয়ে পড়্লাম।

তারপর চার পাঁচ বছর কেটে গেছে।

আমাদের বাড়ীতে হঠাৎ একদিন আমারই বড় আদরের একমাত্র ছেলে শচীন হঠাৎ সর্পাঘাতে মারা গেল। ডাক্তার—কবরেজ—ওঝা—বদ্যি কেউ তাকে বাঁচাতে পারলে না। শচীন জন্মের মত আমাদের ছেড়ে চলে গেল।

বাড়ীতে কান্নার তুমুল হাহাকার।

ভিতরে আমার স্ত্রী মূর্চ্ছিত অজ্ঞান। তাঁকে নিয়ে বাড়ির কয়েক-জন শশব্যস্ত হয়ে উঠেছে। বাইরে এসে দেখি দড়ির খাটিয়ার ওপর শুইয়ে বাছাকে নিয়ে যাবার আয়োজন হচ্ছে।

তখন বহুদিন পরে—কেন জানিনা—সেই পাখীর ছানাটার কথা মনে পড়ে গেল।

সেই চার পাঁচ বছর আগে নিস্তব্ধ দুপুরে বেড়ালের মুখে সেই অসহায় পাখীর ছানাটি, আর তার চারিদিকে পক্ষীমাতাদের আর্ত্ত-হাহাকার।

হঠাৎ একটা অজানা ইঙ্গিতে শিউরে উঠলাম।

একফোঁটা গল্প

রামগঞ্জের জমিদার শ্যামবাবু যে খেয়ালী লোক তা জানতাম। কিন্তু তাঁর খেয়াল যে এতদূর খাপছাড়া হতে পারে তা ভাবিনি। সেদিন সকালে উঠেই এক নিমন্ত্রণ পত্র পেলাম। শ্যামবাবু তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধে সবান্ধবে নিমন্ত্রণ করেছেন। চিঠি পেয়ে আমার মনে কেমন যেন একটু খটকা লাগল। ভাবলাম—শ্যামবাবুর মায়ের অসুখ হল অথচ আমি একটা খবর পেলাম না! আমি হলাম এদিককার একমাত্র ডাক্তার।

যাই হোক নিমন্ত্রণ যখন করেছেন তখন যেতেই হবে। গেলাম, গিয়ে দেখি শ্যামবাবু গলায় কাচা নিয়ে সবাইকে অভ্যর্থনা করছেন। তাঁর মুখে একটা গভীর শোকের ছায়া। আমাকে দেখেই বল্লেন, "আসুন ডাক্তারবাবু—আস্তে আজ্ঞা হোক্।

দু'চার কথার পর জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনার মায়ের হয়েছিল কি?"

শ্যামবাবু একটু বিস্মিত হয়ে উত্তর দিলেন—"ও, আপনি শোনেন নি বুঝি! আমার মা ত আমার ছেলেবেলাতেই মারা গেছেন—তাঁকে আমার মনেও নেই—ইনি আমার আর এক মা—সত্যিকারের মা ছিলেন।"

ভদ্রলোকের গলা কাঁপতে লাগল।

আমি বললাম—"কি রকম? কে তিনি?"

তিনি বলিলেন—"আমার মঙ্গলা গাই—আমার মা কবে ছেলেবেলায় মরে গেছেন মনে নেই—সেই থেকে গাইটিই তো দুধ খাইয়ে আমাকে এত বড় করেছে। ওরি দুধে আমার দেহ মন পুষ্ট। আমার সেই মা আমায় এতদিন পরে ছেড়ে গেলেন ডাক্তারবাবু।"

এই বলে তিনি হু হু করে কেঁদে ফেল্লেন।

আমার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না।

সার্থকতা

আমার অতীত জীবনের দিকে চাহিয়া দেখি—আর আমার দুঃখ হয়! সে যেন একটা সুখ-স্বপ্ন ছিল! সেই আমার অতীত জীবনের স্মৃতি···আজ সত্য সত্যই স্মৃতি মাত্র। মাঝে মাঝে মনে হয় আমার সে জীবন গেল কোথায়? সেই শোভন, সুন্দর, মোহন জীবন।

···একদিন আমার রূপ ছিল—সৌরভ ছিল—মধু ছিল। আমার সেই সুষমার দিনে কত মধুলুব্ধ ভ্রমরই না আমার কানে কানে বন্দনার স্তুতিগান তুলিয়াছে···তাহারা আজ কোথায়?

···এই আকাশ বাতাস আলো একদিন কতই না ভালো লাগিয়াছে! একদিন ইহাদের লইয়া সত্যই আমি পাগল হইয়া থাকিতাম···আজ কোথায় গেল আমার সেই পাগলামি···সেই সহজ উন্মাদনা—ছন্দময়ী ভাললাগার নেশা! আজ কই তারা সব?

...আজ আমি পরিপক্ক—অভিজ্ঞ। আমার সেই অতীতের তরল অনুভূতি জমিয়া যেন কঠিন হইয়া গিয়াছে।

আমার আজ কেবলই মনে হইতেছে···আমার অতীত আর ফিরবে না জানি—কিন্তু ভবিষ্যৎ? সে কেমন কি জানি! আমার আনন্দময় অতীতকে হারাইয়া আজ এই যে, পরিপক্ক অভিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছি—ইহার পরিণতি কি?—ইহার সার্থকতা কোথায়?

*　　*　　*　　*

গাছের একটি পাকা ফল এই সব ভাবিতেছিল। হঠাৎ বাতাসের দোলায় মাটিতে পড়িয়া গেল।···একটি পাখী আসিয়া ঠোঁটে করিয়া ফলটি লইয়া একটি ডালে বসিল এবং পরম আনন্দে ঠোকরাইয়া খাইতে লাগিল।

অজ্ঞাতে

সেদিন আপিসে মাইনে পেয়েছি।

বাড়ী ফেরবার পথে ভাবলাম 'ওর' জন্যে একটা 'বডিস্' কিনে নিয়ে যাই। বেচারী অনেক দিন থেকেই বলছে।

এ-দোকান সে-দোকান খুঁজে জামা কিনতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। জামাটি কিনে বেরিয়ে—বৃষ্টিও আরম্ভ হল। কি করি—দাঁড়াতে হল। বৃষ্টিটা একটু ধরতে—জামাটি বগলে করে'—ছাতাটি মাথায় দিয়ে যাচ্ছি। বড় রাস্তাটুকু বেশ এলাম—তার পরই গলি, তা-ও অন্ধকার।

গলিতে ঢুকে অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে ভাবতে যাচ্ছি—অনেকদিন পরে আজ নতুন জামা পেয়ে তার মনে কি আনন্দই না হবে! আজ আমি—

এমন সময় হঠাৎ একটা লোক ঘাড়ে এসে পড়ল। সেও পড়ে গেল, আমিও পড়ে গেলাম—জামাটা কাদায় মাখামাখি হয়ে গেল।

আমি উঠে দেখি—লোকটা তখনও ওঠেনি—ওঠ্‌বার উপক্রম করছে। রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল—মারলাম এক লাথি!

"রাস্তা দেখে চলতে পার না শুয়ার!"

মারের চোটে সে আবার পড়ে গেল – কিন্তু কোন জবাব করলে না! তাতে আমার আরও রাগ হল—আরও মারতে লাগলাম।

গোলমাল শুনে পাশের বাড়ীর এক দুয়ার খুলে গেল। লণ্ঠন হাতে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—"ব্যাপার কি মশাই?

"দেখুন দিকি মশাই—রাস্কেলটা আমার এত টাকার জামাটা মাটি

করে দিলে। কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে একেবারে। পথ চলতে জানেনা—ঘাড়ে এসে পড়ল—"

"কে—ও? ওঃ—থাক্ মশাই, মাপ করুন ওকে, আর মারবেন না! ও বেচারা অন্ধ বোবা ভিখারী—এই গলিতেই থাকে—"

তার দিকে চেয়ে দেখি—মারের চোটে সে বেচারা কাঁপচে—গা'ময় কাদা। আর আমার দিকে কাতরমুখে অন্ধদৃষ্টি তুলে হাত দুটি জোড় করে আছে।

বেচারাম বাবু

হরিশ মুদী সন্ধ্যাবেলা হিসাব বুঝাইয়া গেল যে গত মাসের পাওনা ২৭৷৷/৫ হইয়াছে এবং তাহা অবিলম্বে মিটাইয়া দেওয়া দরকার। সদ্য অফিস-প্রত্যাগত বেচারামবাবু বলিলেন—"আচ্ছা মাইনেটা পেলেই—!" অতঃপর কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া বেচারাম বাহিরের রোয়াকটিতে বসিয়া হাঁক দিলেন—"ওরে চা আন্—" চা আসিল। চা আসিবার সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার হরিবাবু, নবীন রায়, বিধু ক্লার্ক প্রভৃতি চার পাঁচজন ভদ্রলোকও সমাগত হইলেন এবং সমবেতভাবে গল্প-গুজব সহযোগে চা-পান চলিতে লাগিল।

গল্প চলিতেছে। এমন সময় বেচারামবাবুর ছোট মেয়ে পুটি আসিয়া উপস্থিত—"বাবা, দুখানা চিঠি এসেছে আজ ডাকে। আনব?"

পুঁটির ছোট বোন টুনিও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল। সে কহিল—"আমি আনব বাবা!" বেচারামবাবু মীমাংসা করিয়া দিলেন, "আচ্ছা দু'জনে দুটো আনো!"

শ্রীযুক্ত বেচারাম বক্‌সির পাঁচ কন্যা এবং দুই পুত্র।

পুঁটি ও টুনি দুজনে দু'খানি পত্র বহন করিয়া আনিল। প্রথম পত্রখানি বেচারামবাবুর প্রবাসী পুত্র বহরমপুর হইতে লিখেতেছে—তাহার কলেজ ফি, হষ্টেল চার্জ প্রভৃতি লইয়া এ মাসে ৫৫৲ চাই। দ্বিতীয় পত্রটি তাঁহার কন্যা শ্বশুরবাড়ী হইতে লিখিয়াছে যে গত বৎসর ভাল করিয়া পূজার তত্ত্ব করা হয় নাই বলিয়া তাহাকে অনেক খোঁটা সহ্য করিতে হইয়াছিল। এবার যেন পূজার তত্ত্বে কার্পণ্য করা না হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে শ্বশুরবাড়ীতে তিষ্ঠান দায় হইবে।

বেচারামবাবু চিন্তিত মুখে পত্র দুটি পকেটস্থ করিলেন;

...আবার গল্প চলিল। নবীন রায় একট পান মুখে পুরিয়া কহিলেন—"তোমার মেজ মেয়ের বিয়ের কচ্ছ কি? বিয়ে না দিলে আর ভাল দেখাচ্ছে না!"

বেচারাম কহিলেন—"পাত্র একটি দেখ না!"

নবীন তদুত্তরে বলিলেন—"পাত্র একটি আছে। খাঁইও খুব বেশী নয়। ৫০১৲ নগদ—তেত্রিশ ভরি সোণা আর বরাভরণ। এমন কিছু বেশী নয় আজকালকার দিনে।"

থামিয়া বেচারাম উত্তর দিলেন—তা বটে।

ক্রমে সভাভঙ্গ হইল। বেচারামবাবু অন্দরে গেলেন। ভিতরে গিয়া আহারে বসিতেই গৃহিণী হরিমতি কাছে বসিয়া বসিলেন এবং নানা কথার পর বলিলেন—

"বিনোদের মুখে মাসীমা খবর পাঠিয়েছেন যে, তিনি আসবেন। কিছু আলোচাল আর একসের দুধের কথা বলে দিও তাহলে কাল থেকে। তিনি আফিং খান জান তো?"

শুইতে গিয়া দেখিলেন ছেলেমেয়েরা ঘুম ভাঙিয়া কাঁদিতেছে। বলিলেন—"কি হল ওদের ?"

স্ত্রী বলিলেন—"হবে না ? শীত পড়ে গেছে—কারো গায়ে একটা জামা নেই। লেপটাও ছিঁড়ে গেছে! সেই পাঁচ বছর আগে করান হয়েছিল, ছিঁড়বে না আর! তোমাকে ত বলে বলে হার মেনেছি। কি আর করব বল!"

বেচারাম এবার আর কিছুই বলিলেন না। শুধু টেবিলের উপর আলোটার দিকে চাহিয়া রহিলেন। মোমবাতিটা পুড়িয়া পুড়িয়া প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিতেছে।

সমাধান

আকাশ নীল, বাতাস স্নিগ্ধ, ফুল সুন্দর এবং আমার নাম নীহাররঞ্জন হওয়া সত্ত্বেও আমার বিবাহ হইল পাকুড়াগ্রাম বাসিনী ক্ষান্তমণি নাম্নী এক পল্লীবালার সহিত এবং বৎসরান্তে তিনি একটি কন্যারত্ন প্রসব করিয়া তাহার নাম রাখিয়া দিলেন—বুঁচি! নামকরণটিতে একটু আপত্তি করিয়াছিলাম। তাহাতে বাড়ীর এবং পাড়ার সকলে সত্য কথাই বলিল—"এই কালো কুচ্ছিৎ মেয়ে—তার নাম পুষ্পমঞ্জুরি দিবি নাকি ? তোর যত সব অনাছিষ্টি—"

মেয়েটা কুৎসিতই ছিল। রঙ্ ত কালোই—একটা চোখ ছোট, আর একটা বড়—তাছাড়া কি রকম বোকাহাবা ধরণের—মুখে সর্ব্বদাই লালা ঝরে। পুষ্পমঞ্জুরি নাম দেওয়া চলে না তা ঠিক!

বছর দুই পরে।

ক্ষান্তমনি বুঁচিকে লইয়া বাপের বাড়ী গিয়াছেন। সেদিন রবিবার

কাহারো কাজকর্ম্ম নাই—চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া নানা আলোচনা চলিতেছে। হঠাৎ আমার কথাই উঠিয়া পড়িল!

নৃপেন বলিল—"এই দেখ না নীহারের অদেষ্ট। হল বা যদি একটা মেয়ে—তাও আবার এমন কদাকার—"

শ্যাম বোস বলিলেন—"তা আবার বলতে! বিয়ে দেবার সময় নাকের জলে চোখের জলে হতে হবে আর কি। টাকা চাই প্রচুর!"

হারু খুড়ো তামাকটাতে দু'টান দিয়া কহিলেন—আরে ভাই, আজকাল আবার শুধু টাকা হলেই হয় না। লোকে টাকাও চায়—রূপও চায় যে। চোখ দুটো ছোট বড় হয়েই আরও মুস্কিল কিনা—কি যে হবে—"

সকলেরই ঘোরতর দুশ্চিন্তা।

এমন সময় পিওন আসিয়া আমাকে একখানা চিঠি দিয়া গেল।

নৃপেন বলিল—"কার চিঠি হে?"

আমি চিঠিটা পড়া শেষ করিয়া বলিলাম—"বউ লিখেছে। বুঁচি মারা গেছে কাল।"

ভৈরবী ও পূরবী

কাননে একটি ফুল ফুটিল—যেন বন-লক্ষ্মীর রচিত একটি কবিতা। গন্ধে বর্ণে ছন্দে অপরূপ। ফুল চাহিয়া দেখিল তার চরিদিকে আনন্দের উৎস লাগিয়াছে। আকাশে বাতাসে আলোতে যেন কিসের আকুলতা। বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া তাহার চোখে পলক পড়ে না।

আকাশের নীলে ভরিল নয়ন
আলোর সোহাগে আকুল তনু,
রূপসী উষার সোনার পরশে
হরষে ভরিল প্রতিটি অণু।

কে যেন কহিছে "বন-লক্ষ্মীর
স্বপ্ন যে তুমি ধরেছ কায়া
তাই বন-ভরি বাজে আশাবরী
আলোতে লেগেছে রঙীন মায়া।"

গুঞ্জন তুলিয়া কে যেন তাহার কানে কানে কহিল—

অঙ্গ ভরিয়া এনেছ বর্ণ
এঁকেছ নয়নে মোহন ছবি—
আঁখি তুলে চাও আজি এ প্রভাতে
এসেছি যে আমি তোমারি কবি।

চকিত হইয়া ফুল কহিল—"কে তুমি?"
"আমি ভ্রমর"
"কি চাও?"

ভ্রমর কহিল—

কি যে চাই সখি জানিনা ত তাই
তবে মনে হয় আজিকে প্রাতে
এতটুকু মধু দিতে যদি তুমি
তোমার রঙীন সোহাগ সাথে।
মুখ তুলে' সখি আঁখি মেলে চাও
বিফল কোরো না এমন আলো,
গুণ্ঠন খোলো একবার ওগো
তোমারেই আমি বেসেছি ভালো।

এই শুনিয়া ফুলের হঠাৎ কেমন লজ্জা হইল—সে মাথা নত করিল। বৃন্তের উপর সে তার সরম শঙ্কিত দেহকে যেন লুপ্ত করিয়া দিতে চায়। অলি ঘুরিয়া ফিরিয়া গাহিতে লাগিল।

গুণ্ঠন খোলো ওগো কাননিকা
ব্যর্থ করো না এমন আলো।
গুণ্ঠন খোলো গুণ্ঠন খোলো
তোমারেই আমি বেসেছি ভালো।

ফুল কিন্তু কিছুতেই গুণ্ঠন খুলিতে পারিল না। অপরিসীম লজ্জায় যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট অবশ হইয়া আসিল। তাহার হৃদয়ের দ্বারে কে যেন মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল—"না, না, না—না—না—"

অবশেষে ভ্রমর কহিল—তবে যাই।

এমন আলো এমন বাতাস হয়ত আবার উঠ্‌বে না,
যদিই ওঠে হয়ত তখন বন্ধু এমন জুটবে না।

এই যে প্রাতে ওই রবিতে

গান ধরেছে ভৈরবীতে

হয়ত তাতে আর কোন দিন এই মাধুরী ফুটবে না।

ভ্রমরের গুঞ্জন দূর হইতে সুদূরে মিলাইয়া গেল।

* * * *

ভ্রমর যখন চলিয়া গেল তখন, কি আশ্চর্য্য, ফুলটির যেন ঘুম ভাঙিল। তাহার মর্ম্মের মাঝখানে যেন গুঞ্জন গানে বাজিতে লাগিল—

গুণ্ঠন খোলো একবার ওগো

তোমারেই আমি বেসেছি ভালো

তাহার রঙীন পাপড়ি ভরিয়া গন্ধ জাগিয়া উঠিল। নিশ্বাস ফেলিয়া সে প্রার্থনা জানাইতে চায়—"আহা সে যদি আর একবার আসে!"—কিন্তু সে আসিল না। কুসুমের প্রাণের কামনায় প্রভাত-সমীরণ মদির হইয়া গেল। প্রভাত বহিয়া গেল, দ্বিপ্রহরও উত্তীর্ণ হইল, সন্ধ্যা হয়-হয়—কিন্তু কোথা সে, যার ধ্যানে

অঙ্গ ভরি অবিরাম উঠিছে উচ্ছ্বসি'

ছন্দ-ভরা ঘন গন্ধ ভার

যার গানে মুখরিত গগন পবন

মুখরিত আলো-অন্ধকার!

কই সে? সে ত আর আসিল না। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিল।

ছোট ফুলটির আঁধারে আলো জ্বালাইয়া জোনাকী আসিল।

ম্লান কণ্ঠে ফুল তাহাকে শুধায়—"কে ভাই তুমি?"

"আমি জোনাকী।"

আগ্রহ ভরে ফুল জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি তাকে চেন কি ?"

"কা'কে ?"

"যে আমায় আজ সকালে গানে গানে বলেছিল "—গুণ্ঠন খোলো। তার আশায় আজ সারাদিন বসে আছি। সে ত আর এল না। তুমি তা'কে চেন কি ?"

জোনাকী বলে—"মনে ত হয় না।"

মিনতি করিয়া ফুল তাহাকে কহিল—"তার সঙ্গে যদি দেখা হয় বোলো সে যেন আর একবার আসে।"

"দেখা পাই ত বলব"—এই বলিয়া জোনাকী উড়িয়া গেল। সন্ধ্যার মৃদু বাতাসে কাঁপিয়া ফুলটির সর্ব্বাঙ্গ যেন গান গাহিতে লাগিল !

সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় হইতে নিবিড়তর হইয়া গেল।

* * * *

* * * * * * * *

তারপর দিন সন্ধ্যায় জোনাকী আসিয়া কহিল—"খুঁজে পেলাম না তা'কে।"

ফুল কহিল—"কা'কে ?"

"তুমি কাল যার কথা বলেছিলে ?"

"আমি ত কাল ছিলাম না—আজ ফুটেছি।"

"কালকের ফুল কোথা ?"

"সে ঝ'রে গেছে। তারই পাশের বোঁটায় আমি ফুটেছি আজ"

জোনাকী চুপ করিয়া রহিল।

তখন নূতন ফুলটি বলিল—"আচ্ছা, তুমি একজনকে চেন কি ?"

"কা'কে ?"

যে আজ সকালে কেবল গুঞ্জন-গানে আমাকে ব'লে গেল,

"গুণ্ঠন খোলো ওগো কাননিকা,

ব্যর্থ কোরো না এমন আলো"

তার আশায় আজ সারাদিন বসে আছি আমি। যদি তার দেখা পাও আসতে বোলো আর একবার। বলবে ?"

"দেখা পাই ত বলব"—মৃদু হাসিয়া জোনাকী উড়িয়া গেল—আঁধারের বুকে ছোট্ট একটি আলেয়া!

আদ্বতায়া

বেশ ছিলাম।

আপিসে সাহেব এবং গৃহে মা-ষষ্ঠী আমার প্রতি সদয় ছিলেন। সাহেব আমার মাহিনা এবং মা-ষষ্ঠী আমার সংসার বাড়াইতেছিলেন। আমার পিতৃমাতৃকুলে আর কেহ ছিল না। উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু টাকাও জুটিয়া গিয়াছিল। খাসা ছিলাম।

প্রভাবতী অর্থাৎ আমার গৃহিণী গড়ে বছরে দেড়টি করিয়া সন্তান প্রসব করিয়া চারি বৎসরেই আমাকে ছয়টি পুত্রকন্যার মালিক করিয়া তুলিয়াছিলেন—মাঝে দুইবার যমজ হয়।

এবম্বিধ প্রজাবৃদ্ধিসত্ত্বেও কোন অভাব ছিল না। হঠাৎ কিন্তু বেকুব বনিয়া গেলাম।

পঞ্চম বর্ষেও গৃহিণী তাঁহার স্বাভাবিক গর্ভভার বহন করিতে-ছিলেন। এবার কিন্তু ব্যাপারটা স্বাভাবিক হইলেও সহজ ছিল না বোঝা গেল। কারণ তিনি মারাই গেলেন। তিনি তাঁহার পিত্রালয় শান্তিপুরে ছিলেন। যদিও আমার শ্বশুর ও শাশুড়ী উভয়েই অনেক-

কাল স্বর্গীয় হইয়াছেন, কিন্তু আমার শ্যালক বিনোদ ডাক্তার বলিয়া প্রভা প্রতিবারই সেখানে যাইত। বিনোদ লিখিতেছে—

"হঠাৎ 'এক্লেম্প্‌সিয়া' হইয়া দিদি তিন চার ঘণ্টার মধ্যেই মারা গেলেন। আপনাকে খবর দেওয়ার সময় ছিল না। 'কিডনি' খারাপ ছিল। সেজদি ছেলেদের লইয়া সম্বলপুরে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চিঠি বোধ হয় পাইয়াছেন।"

পাইলামও। তিনি লিখিতেছেন—"কি করিবে বল ভাই। সবই অদৃষ্ট। তোমার ছেলেমেয়েরা এখন আমার কাছে কিছুদিন থাকুক। আমি ত বাঁজা মানুষ। আমার কোন অসুবিধা হইবে না। ছেলেরা ভালই আছে। কোন ভাবনা করিও না। ইতি…"

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ছুটির দরখাস্ত করিলাম। কপালগুণে আমার সাহেবও বদলি হইয়া গিয়াছিলেন। ছুটি সুতরাং মঞ্জুর হইল না।

২

দুই মাস পরে।

সম্বলপুরবাসিনী শ্যালিকার আর একখানি পত্র পাইলাম। তিনি অন্যান্য নানা কথার পর লিখিতেছেন—

"প্রভা সতীলক্ষ্মী ভাগ্যবতী ছিল। সে গেছে, বেশ গেছে। জাজ্বল্যমান সংসারে স্বামী ছেলেপুলে সব রেখে গেছে। কিন্তু তোমার তা বলে সংসারটা ছারখার করা ত ভাল দেখায় না। উচিতও নয়। আমার কথা শোনো। আবার বিয়ে কর তুমি।…এখানে একটি বেশ ডাগর-ডোগর মেয়ে আছে। যদি তোমার ইচ্ছে হয়—বলো, সম্বন্ধ করি। আমার ত মেয়েটিকে বেশ পছন্দ। তোমার নিশ্চয়ই পছন্দ হবে।"—ইত্যাকার নানারূপ কথা।

সাত দিন ভাবিয়া—অর্থাৎ এক টিন চা ও পাঁচ টিন সিগারেট নিঃশেষ করিয়া আমি এই চিরন্তন সমস্যার যে মীমাংসা করিলাম তাহা মোটেই অসাধারণ নয়। সেজদিকে যে পত্র দিলাম তাহা অংশতঃ এইরূপ—

"বিয়ে করতে আর ইচ্ছে হয় না। প্রভার কথা সর্ব্বদাই মনে পড়ে। কিন্তু দেখ সেজদি, আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছের উপর নির্ভর করে ত সংসার বসে নেই। সে আপনার চালে ঠিক চলছে ও চলবে। সুতরাং ভাবপ্রবণ হওয়াটা শোভন হলেও সুযুক্তির নয়—এটা ঠিকই। তা ছাড়া দেখ, আমরা "মা ফলেষু কদাচন" দেশের লোক। আর তোমরাও যখন বলছ—তখন আর একবার সংসারটা বজায় চেষ্টা করাই উচিত বোধ হয়।···দ্বিতীয় পক্ষের বিয়েতে আবার পছন্দ! তোমার হয়েছে ত ?···"

ক্রমশঃ বিবাহের দিন স্থির হইল। সম্বলপুরেই বিবাহ। সেজদি বুদ্ধিমতী। লিখিয়াছেন—"ছেলেদের লাহোরে বড়দির কাছে পাঠিয়ে দিলাম। বাপের বিয়ে দেখতে নেই।" স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলাম।

যথাকালে সাহেবের হাতে-পায়ে ধরিয়া হপ্তাখানেকের ছুটি লইয়া সোজা রওনা হইয়া পড়িলাম। একাই। এ বিয়ের কথা কাউকে বলিতে আছে ? কি ভাবিয়া গোঁফটা কামাইয়া ফেলিলাম। একে এই কালো মোটা চেহারা—তাহার উপর কাঁচাপাকা একঝুড়ি গোঁফ লইয়া বিবাহ করিতে যাইতে নিজেরই কেমন বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল।

বিবাহ-বাসর।

ওই অবগুণ্ঠিতা চেলি-পরা মেয়েটিই আবার আমার সঙ্গিনী হইতে চলিয়াছে। প্রভাকেও একদিন এই ভাবেই পাইয়াছিলাম—সে

কোথায় চলিয়া গেল। আজ আবার আর একজন আসিয়াছে। ইহার "কিডনি' কেমন—কে জানে! নানারূপ এলোমেলো কথা মনে আসিতে লাগিল। প্রভার মুখ বারবার মনে পড়ে। ছেলেগুলো না জানি এখন কি করিতেছে ?···মৃত্যুর পরও কি আত্মা সত্যি থাকে ?··· এ মেয়েটি বেশ বড়সড় দেখিতেছি—কিন্তু ভারি জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে—একেবারে মাথা নীচু করিয়া। আচ্ছা প্রভার আত্মার যদি······গৃহ্ণামি·····...গৃহ্ণামি······

যন্ত্রচালিতবৎ বিবাহ-অনুষ্ঠান চলিতে লাগিল। শুভদৃষ্টির সময় মেয়েটি কিছুতেই ঘোমটা খুলিল না। সেজদি বলিলেন—ভারি লাজুক। বাসর-ঘরেও শুনিলাম, ভারি লাজুক। আপাদমস্তক মুড়িয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। আমিও ঘুমাইলাম। সেজদি লোক জমিতে দেন নাই। তা ছাড়া দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহে কে আর আমোদ করিতে চায় ? মেয়েটির আপন বলিতে কেহ ছিল না। পরের বাড়ীতে মানুষ। সেজদির বাড়ীতেই বিবাহ—বলিতে গেলে সেজদিই কন্যাকর্ত্তা। সুতরাং বিবাহ-উৎসব জমে নাই!

* * * *

জমিল ফুলশয্যার রাত্রে!

বক্ষে অনেক আশা ও আশঙ্কা লইয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখি আমার ছয়টি সন্তান ও আরও একটি নবজাত শিশু লইয়া স্বয়ং প্রভা খাটে বসিয়া! স্বপ্ন দেখিতেছি না কি ?

প্রভা কহিল—"ছি, ছি, সেজদিরই জিৎ হল!"

"মানে ?"

"মানে আবার কি ? এবার ছেলে হওয়ার সময় ভারি কষ্ট হয়েছিল। অপরাধের মধ্যে সেজদিকে বলেছিলাম যে আমি মলে

ওঁর ভারি কষ্ট হবে। সেজদি বললে—হাতী হবে। তিনমাস যেতে না যেতে ফের বিয়ে করবে। আমি বললাম—কক্‌খনো নয়। তারপর বাজি রেখে সেজদি আর বিনোদ মিলে এই ষড়যন্ত্র। আমি শান্তি-পুরেই ছিলাম। আজ এই সন্ধ্যেবেলা এসেছি। এসে দেখি সেজদিরই জিৎ। পাড়ার মাণ্‌কে ছোঁড়াকে কনে' সাজিয়ে সেজদি বাজী জিতেছে। একশটি টাকা দাও এখন! ছি ছি—কি তোমরা! অমনি গোঁফটা কি বলে কামালে ?"

আমার অবস্থা অবর্ণনীয়।

পরদিন প্রভাতে সেজদির পাওনা চুকাইয়া দিয়াছি। এখন গোঁফটা উঠিলে যে বাঁচি!

খেঁকি

১

যদিও বাঙালী নহি—কিন্তু তবুও আমার জীবনকাহিনী করুণ। যদিও আমি সামান্য কুকুর মাত্র, তথাপি হে বাঙালী ভাই, খোঁজ করিলে তোমারই মত আমার শোণিতেও আভিজাত্যের আমেজ পাওয়া যাইবে। শুনিয়াছি আমার অতি বৃদ্ধ পিতামহীর কোনো প্রণয়ী বুলডগ-বংশাবতংস ছিলেন এবং সেই বুলডগ শোণিতধারার কিয়দংশও আমার ধমনীতে এখনও প্রবাহিত হইতেছে ভাবিয়া আমি আত্মপ্রসাদ লাভ করি। লোকে কিন্তু আমাকে বলে খেঁকি কুকুর! সত্য বটে আমার গায়ে লোম নাই—সর্ব্বাঙ্গে ঘা—চোখে ভাল দেখিতে পাই না—স্টেশনের ধারে পরিত্যক্ত পাতা ও ঠোঙা লইয়া অন্যান্য কুকুরদের সহিত মারামারি করিয়া আমার দিনপাত হয়—সবই সত্য; কিন্তু

তথাপি আমি কিছুতেই ভুলিতে পারি না, আমার পূর্ব্বপুরুষ বুলডগ ছিলেন। ইহাই আমার সান্ত্বনা—ইহারই প্রভাবে আমার মনে হয় আমার এ দুর্দ্দিন থাকিবে না। ভগবান একদিন মুখ তুলিয়া চাহিবেন।

২

সেদিন সকালে স্টেশনে গাড়ী আসিয়া থামিয়াছে। আমি ঠোঙা চাটিবার প্রত্যাশায় গাড়ীর প্রতি বাতায়ন-পথে লুব্ধদৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখিতেছি। এমন সময় পিছন হইতে কে আমার গলায় একটা দড়ির ফাঁস লাগাইয়া আমাকে বাঁধিয়া ফেলিল। চাহিয়া দেখি স্টেশনের পরিচিত কুলী—মিঠ্ঠু! মিঠ্ঠুর হাতে অনেকবার মারও খাইয়াছি, ভাতও খাইয়াছি। স্টেশনের ধারে তার বাড়ী—সে আমাকে মারধোর করিলেও—ডাকিয়া প্রায়ই ভাত-রুটি দিত। হঠাৎ সেই মিঠ্ঠু আমাকে একেবারে বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া চলিল কেন—কিছুই বুঝিলাম না। এতদিনে কি তাহার হুঁস হইয়াছে যে আমার মতন এমন একটা বুলডগ-বংশধরের পক্ষে এরূপ ভিক্ষুকের মত ঘুরিয়া বেড়ানটা অশোভন? তাই কি সে চায় যে আমাকে অভিজাতবংশীয় কুকুরদের মত বাঁধিয়া খাওয়াইবে? জানি না কি তাহার মনোভাব। টানিতে টানিতে সে কিন্তু সোজা আমাকে স্টেশন-মাষ্টারের কামরায় লইয়া গেল।

৩

স্টেশন-মাষ্টার বৃদ্ধ। আমার দিকে একবার তাকাইয়া বলিলেন, "আরে এ কোত্থেকে একটা খেঁকি কুত্তো নিয়ে এলি?"

—"ওইতেই হবে—A dog ত বটে—ওর বেশী ত আর কিছু লেখা নেই।"

তাঁহার সহকারী ছোকরাটি ফোড়ন দিল।

মালবাবু ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপার কি মশাই? এ কুকুরটাকে বেঁধে রেখেছেন কেন?

স্টেশন-মাষ্টার তখন বিবৃত করিয়া বলিলেন—"আর বলেন কেন মশাই! চাকরি বুঝি আর থাকে না। কোন এক সাহেব মহাপ্রভু—এই গাড়ীতে যাচ্ছেন—তার নাকি এক কুকুর Dog Box-এ ছিল; আমরা ত দেখছি খালি—আমাদের আগের ষ্টেশন বলছে যে তারা Dog Box-এ কুকুর দেখেছে। অথচ এখানে দেখছি—Dog Box খোলা। বেটা কুকুর হয়ত কোথাও পড়ে ফড়ে গেছে—আমাদের রামসুন্দরবাবু বলছেন, দিন যে কোন একটা কুকুর পুরে—তারপর দেখা যাবে। রেল কোম্পানি ত A Dog বলে বুক করেছে—A Dog হলেই হল। তারপর ব্যাটার কুকুর যদি পছন্দ না হয় ত কোর্টে গিয়ে বোঝাপড়া করুক গে! যত সব আপদ জোটে আমারি ঘাড়ে। কি বলেন? দোব এ কুকুরটাকে ঢুকিয়ে? একেবারে রোঁয়া নেই।"

মিঠ্ঠু বলিল—এত তাড়াতাড়ি অন্য কুকুর পাওয়া সম্ভব নহে।

মালবাবু বলিলেন—"দিন ত দুর্গা বলে চড়িয়ে। তারপর দেখা যাবে—"

মিঠ্ঠু আমাকে টানিতে টানিতে লইয়া গিয়া Dog Box-এ তুলিয়া দিল। ট্রেন ছাড়িয়া গেল।

চলিয়াছি। নববধূ যেমন তার আজন্মপরিচিত গৃহ ছাড়িয়া অজানা অচেনার উদ্দেশ্যে আশা-আশঙ্কা-উদ্বেল-হৃদয়ে যাত্রা করে আমিও তেমনি চলিয়াছি। জানি না আমার এই অজানা সাহেব কেমন লোক! যেমনই লোক হোক্, সাহেবেরা শুনিয়াছি ভাল কুকুরের আদর জানে। তাছাড়া সত্যই ভাল কুকুরকে চেনে—যত্নও করে। তাই

আমার আশা আছে যে বুলডগ-পূর্ব্বপুরুষের আভিজাত্য সে আমার জীর্ণ অঙ্গেও খুঁজিয়া পাইবে। শুনিয়াছি সাহেবেরা কুকুরকে মাংস খাইতে দেয়। মাংস কেমন কখনো খাই নাই। মাঝে মাঝে দু-এক টুকরা শুষ্ক অস্থি চিবাইয়াছি—কিন্তু ভাল মাংস শুনিয়াছি অতি অপরূপ জিনিস—সাহেবেরা শুনিয়াছি রোজ মাংস খাইতে দেয়। শুনিয়াছি···

ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া দেখি একটা স্টেশনে গাড়ী দাঁড়াইয়াছে। পশ্চিম গগনে সূর্য্য অস্তোন্মুখ।

একটু পরেই দরজাটা খুলিয়া গেল এবং একটা কুলী আসিয়া আমাকে টানিয়া বাহির করিল। বুঝিলাম, এইবার আমার সাহেব মনিবের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইবে। মিলন-লগ্ন আসন্ন হইয়া আসিয়াছে। সহসা বুকের ভিতরটা কেমন কাঁপিয়া উঠিল—আশায় আনন্দে, না ভয়ে—বলিতে পারি না। কেমন যেন মনে হইল, আর চলিতে পারিতেছি না। সেই কঙ্করময় প্লাটফর্মের উপর বসিয়া পড়িলাম। কুলীটা কিন্তু আমার অন্তরের আকুলতা বুঝিল না—কাঁকরের উপর দিয়াই হেঁচড়াইয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

*   *   *

সাহেব দাঁড়াইয়া ছিলেন।

কুলী গিয়া সেলাম করিয়া বলিল—"হুজুর, কুত্তা লে আয়া।"

সাহেব বলিলেন—"What ? what's the joke ?"

ক্ষীণ ভীরু দৃষ্টি তুলিয়া প্রভুর দিকে চাহিতে যাইব, এমন সময় আমার মুখের উপরেই সজোরে সবুট পদাঘাত করিয়া সাহেব গর্জ্জিয়া উঠিলেন "লে যাও হিয়াসে—station masterকো বোলাও।"

*   *   *

তারপর কি ঘটিল জানি না। দড়ি ছিঁড়িয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া আসিয়া এক ভদ্রলোকের আঙিনায় ঢুকিয়া পড়িলাম। দেখিলাম, কেহ কোথাও নাই। আঙিনার এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। একটু পরেই দেখিলাম, এক ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন। করিয়াই ডাকিলেন—"ওগো, শুন্‌চ ?"

"কি হল"—বলিয়া এক উদ্‌গ্রীব তরুণী বাহির হইয়া আসিলেন।

"চাকরি হল না। সাহেব বল্লে—ও postএ বাঙালী নেওয়া হবে না—সাহেবদের জন্য ওটা Reserved। অমন চাকরি কি আর ভেতো বাঙালীর অদৃষ্টে জোটে!"

হঠাৎ তাহাদের নজর পড়িল আমার উপর। তরুণীটি বলিলেন, কোত্থেকে একটা লোম-ওঠা পাগলা কুকুর এসেছে দেখ। নাকে মুখে রক্ত লেগে আছে। নিশ্চয়ই কামড়েছে কাউকে। ভয় করছে আমার। মেরে দূর কর এখনি।"

ভদ্রলোকটি বেগে লাঠি তুলতেই খিড়কি দরজা দিয়া সুট করিয়া সরিয়া পড়িলাম!

অনির্ব্বচনীয়

ক্ষণিকা খাস্তগীরের মস্তকে বজ্রপাত হইয়াছে। এখনও কিন্তু সে মরে নাই বরং এ অবস্থায় মরা উচিত কিনা এবং উচিত হইলেও সহজ অথচ মর্ম্মান্তিক মৃত্যুর উপায় কি—তাহাই ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবার জন্য সে ছাদে পায়চারি করিতেছে। কেরোসিন তেল, গলায় দড়ি, পুকুরে ডোবা, এমন কি cyanide পর্য্যন্ত নিতান্ত মামুলি হইয়া পড়িয়াছে। যক্ষ্মার জীবাণু শুঁকিলে হয় না?

হঠাৎ পিছনে রমেশ বাবুর চটির শব্দ।

"খন্তু, এখানে আছিস?—এই যে। আচ্ছা, কি ছেলেমানুষ বল ত তুই!"

ক্ষণিকা কোন কথা কহিল না।

রমেশবাবু বলিলেন—"কথা বলছিস না যে! আমি কি এক্ষুণি তোর সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়ে দেব? কথাটা ভেবে দেখতে দোষ কি?"

ক্ষণিকা বলিল—"তুমি যে বাবা শেষকালে আমাকে একটা দোজবরের হাতে দেবে, একথা ভাবতেও পারি না!"

রমেশবাবু বলিলেন—"বেশ ত তাকে না-ই করলি বিয়ে। আমার ছেলেটিকে ভালো লাগল—তাই বলছিলাম। বিদ্বান, বড় চাকরি করে, চমৎকার স্বাস্থ্য। ছেলেপিলে কিছু নেই। হলই বা দ্বিতীয় পক্ষ। বেশ ত বাপু তোর পছন্দ না হয়, করিস না বিয়ে। এখন শুবি চল। তোরা লেখাপড়া শিখে শুধু টন্সিল দুটোই বড় করেছিল—বুদ্ধি কিছু বাড়ে নি।"

মাতৃভাবাপন্ন রমেশবাবু তাঁহার মাতৃহীন কন্যাকে লইয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

বলিতে ভুলিয়াছি—প্রথমেই বলা উচিত ছিল—ক্ষণিকা খাস্তগীর ইংরেজীতে 'অনার্স' লইয়া বি-এ পাশ করিয়াছেন। প্রধান মাসিক-পত্রগুলিতে তাঁহার ছবি ছাপা হইয়া গিয়াছে।

ক্ষণিকা পরদিন বান্ধবী সুজাতাকে বলিল—"যাক খুব ফাঁড়াটা কেটে গেল। লোকটার আক্কেলকে বলিহারি যাই। বউ মরতে না মরতে অমনি বিয়ের তাড়া পড়েছে। পুরুষগুলো আমাদের দেখছি সিগারেটের সামিল করে তুলেছে। একটা ফুরোতে না ফুরোতে আর একটা ধরান চাই। এ ভদ্রলোক যেন আরো ব্যস্তবাগীশ! যেন

আগের স্ত্রীর চিতার আগুন থেকেই দ্বিতীয় বিয়ের হোমের কাঠগুলো ধরিয়ে নিতে চান!"

সুজাতা জিজ্ঞাসা করিল—"ব্যাপার কি? ভদ্রলোক কে?"

ক্ষণিকা উত্তর দিল—"ভদ্রলোকের নাম—অজয়কুমার বোস। সরকারী চাকরি করেন—কবিতাও লেখেন। কাব্যরস একটু বেশীমাত্রায়!"

সুজাতা কেবল কহিল—"তাই নাকি?"

ক্ষণিকার উত্তেজনা তখনও কমে নাই। সে বলিয়া চলিল—"আমার ত মনে হয়, আইন করে এসব বিয়ে বন্ধ করা উচিত!"

সুজাতা কিছু বলিল না।

সুজাতা তখন কিছু বলিল না বটে—কিন্তু এ সম্বন্ধে তাহার আইন-জ্ঞান হাতেকলমে দেখাইয়া দিল। মাসখানেক পরে সুজাতা দেবীর সহিত অজয় বোসের শুভবিবাহের নিমন্ত্রণ-লিপি পরিচিত মহলে বিতরিত হইতে লাগিল।

* * *

বন্ধুর স্বামী। আলাপ হইলই। একদিন কথায় কথায় হাসিতে হাসিতে ক্ষণিকা অজয়বাবুকে কহিল, "ছেলেবেলায় আপনি 'ট্রাই ট্রাই এগেন কবিতাটি ভাল করেই পড়েছিলেন দেখছি!"

অজয়বাবু বলিলেন—"সে ত পড়েইছি! তা ছাড়া কি জানেন, প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ার পর—বড় বড় লোক এসে দিনরাত অনুরোধ করতে সুরু করলেন—"কি করি বলুন! নিজের তাগিদ ত ছিলই—"

ক্ষণিকা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—"বড় বড় লোক মানে?"

"এই ধরুন না কেন যুগ্মপত্নীর স্বামী যাজ্ঞবল্ক্য থেকে সুরু করে—

শেলি, বায়রণ, মোপাসাঁ, রবীন্দ্রনাথ সবারই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—এমন কি আমাদের সত্যেন দত্ত পর্য্যন্ত বলছেন—

কে গেছে কে যায় আর
অত শত ভাবনার
ফুরসুৎ নেই আজ—নেই বন্ধু!

ওই যে ওমর খৈয়াম আপনি বিয়েতে উপহার দিয়েছেন সে ভদ্রলোক ত নাছোড়! এখন ভেবে দেখুন, ভদ্রভাবে ওঁদের অনুরোধ রক্ষা করতে হলে আমাদের মত গরীব লোকের বিয়ে করা ছাড়া উপায় কি!"

আরক্তিম-কর্ণমূল হইয়া ক্ষণিকা বলিল—"থামুন—থামুন, আপনাদের বোঝা গেছে!"

কিন্তু অজয়ের সপ্রতিভ সরস উত্তরটা সে মনে মনে উপভোগ না করিয়া পারিল না। লোকটি রসিক—সুজাতা সুখী হইবে।

* * *

কিছুদিন পরে শোনা গেল সুজাতা আত্মহত্যা করিয়াছে এবং তাহারও কিছুদিন পরে শোনা গেল অজয় বাবু নাকি আবার বিবাহ করিতেছেন এবং এবার নাকি ক্ষণিকা খাস্তগীরকে।—'লভ্ ম্যারেজ'।

রামায়ণের এক অধ্যায়

অভিনয় কাণ্ড

সীতাকে বনবাসে দিয়া রাম পত্নীশোকে উন্মত্তপ্রায়। কেবলই তাঁহার মনে হইতেছে—ঘোরতর অবিচার করিয়াছি।

কুলগুরু বশিষ্ঠকে বলিতেছেন—"গুরুদেব, অবিচার! এ ঘোর

অবিচার ; সীতার কোন অপরাধ নাই—তিনি নিরপরাধিনী, দেবী। আমার কোন অধিকার নাই তাঁকে শাস্তি দিবার! আমি মহাপাপ করিয়াছি, আমি—"

তাঁহাকে থামাইয়া দিয়া বশিষ্ঠ বলিলেন—"বৎস, সত্যরক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। তুমি সত্যাশ্রয়ী। সত্যধর্ম্ম পালন করিয়া প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের কার্য্য করিয়াছ।"

রাম বলিলেন,—"এতো সত্য নয়—এ যে মিথ্যা। এ যে অবিচার গুরুদেব—এ যে মিথ্যাচার—গুরুদেব—"

গুরুদেব বলিলেন,—"অধীর হইও না বৎস, রাজধর্ম্ম বড়ই কঠিন।"

রামচন্দ্র শুনিলেন না। অধীর হইয়া উঠিলেন।

"রাজ্য চাই না, ঐশ্বর্য্য চাই না—প্রজাপুঞ্জের মতামত গ্রাহ্য করি না—সীতাকে চাই! আমার দেবীকে চাই! রাজ্য যাক—মান যাক..."

রাম পাগল হইয়া গেলেন।

২

অভিনেতা নকুড় মাইতি রামের অভিনয় শেষ করিয়া যখন শেষ-রাত্রে বাড়ী ফিরিলেন তখন তাহার পা টলিতেছে—মদের নেশায় চুরচুর।

ঠেলাঠেলির পর স্ত্রী হরিমতি দ্বার খুলিয়া দিলে নকুড়বাবু বলিলেন—"হারামজাদি, আধঘণ্টা ধরে দোর ঠেলছি, খেয়াল নেই?"

হরিমতি বলিলেন—ঘুমিয়ে পড়েছিলাম..."

নকুড় মাইতি কহিলেন—"ফের কথার ওপর কথা।"

বলিয়াই এক লাথি এবং রাম লাথি।

স্কুলের স্মৃতি

গত বর্ষায় বেশ একটু কাবু করিয়াছিল। পল্লীগ্রামে বাস করি, সুতরাং বর্ষার আগমন আমার পক্ষে মনোরম না হইবার কথা। কিন্তু একটি স্থূলাঙ্গিনী রমণীর প্রেমে পড়িয়া অবস্থা অন্যরূপ দাঁড়াইয়া গেল। বিস্তৃত বিবরণ দিয়া লাভ নাই। সংক্ষেপে এইটুকু জানিয়া রাখুন, সেদিন শ্রাবণ সন্ধ্যার প্রাক্কালে সমস্ত ব্যাপারটির আনুপূর্ব্বিক আলোচনা করিয়া বুঝিলাম কাব্যরসে কুলাইবে না—কিছু চোলাই রসের প্রয়োজন। দোকান আমার বসত বাটি হইতে দেড় ক্রোশ দূরে। উপায়ান্তর নাই দেখিয়া হাঁটু পর্য্যন্ত কাপড় তুলিয়া কাদায় ছপ্ ছপ্ করিতে করিতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

* * *

গঙ্গার তীর। দুকূলপ্লাবিনী বর্ষার গঙ্গা। শ্রাবণের পূর্ণিমা তিথি। মেঘে আর জোৎস্নায় নির্জ্জন নদীতীরে…যাক্ বর্ণনা করিয়া সময় নষ্ট করিব না। সে আর আমি মুখোমুখি বসিয়াছিলাম। এই আমাদের প্রথম নির্জ্জন সাক্ষাৎ। চারিদিকে জনমানবের চিহ্ন নাই—একটু দূরেই স্থানীয় শ্মশান। আকাশে মেঘ ও জোৎস্না। সম্মুখে বেগবতী বর্ষার নদী। ট্যাঁকে কিঞ্চিৎ ধন ও উদরে প্রচুর 'ধেনো'। বিকম্পিত কণ্ঠে বলিলাম—"আর একটু কাছে এসে বস না।"

রমণী দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—"না।"

আমি আবেগভরে বলিলাম—"কেন? বল, কেন?"

রমণী এবার কিছু না বলিয়া একটু সরিয়া বসিল। আমিও আর একটু কাছে গিয়া বলিলাম—

"কেন ? বল, কেন ? ভয় করছে ? কিসের ভয় তোমার। সরে এসো লক্ষ্মীটি।"

"না—" বলিয়া সে আর একটু সরিয়া বসিল। আমি আবার একটু কাছে গিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলাম—

"তুমি বিয়াত্রিচের গল্প শুনেছ ? যার প্রেমে দান্তে পাগল হয়েছিলেন ? শোন নি ? জোহান বোয়ারের 'লাইফ পড়েছ ? যাতে সেই স্কুলমাস্টার, তাও শোন নি ? বেশ, কেষ্টরাধার কথা ত জান ? এবার ভেবে দেখ দিকি সেই যমুনার কূলে—"

এবার রমণী বলিল—"আমরা হলাম কৈবর্ত্তের মেয়ে—!"

উদ্বেলিত হৃদয়ে বলিলাম—"হোক্—তাতে ক্ষতি নাই! দোহাই তোমার, একটু কাছে সরে এসো।" বলিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিলাম।

এক ঝটকায় হাত ছাড়াইয়া লইয়া সে আরও খানিকটা সরিয়া গেল। আমিও তৎক্ষণাৎ আবার তাহার কাছে গিয়া বসিলাম।

বৃষ্টি সুরু হইয়া গেল। গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিলাম না। বলিলাম, "দেখ, জীবন খুব ছোট—এই ক্ষুদ্র জীবনে আজ যে শুভ মুহূর্ত্তটি এসেছে—নষ্ট কোরো না তাকে। শুনছ ? যত টাকা লাগে—! শুনছ ?"

রমণী কিছু বলিল না। হাত ধরিতেই কিন্তু আবার সরিয়া বসিল। আমিও সরিয়া গেলাম।

শ্রাবণের আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। রমণী কিন্তু ভিজিল না। তখন মনে হইল গান গাহিয়া দেখি যদি কিছু হয়। গলা যতদূর সম্ভব মোলায়েম করিয়া গান ধরিলাম—

"বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিস্ নে আজি দোল
বা—গিচায়!"

হঠাৎ দেখি সে কাৎ হইতেছে।

"ওকি, অমন করছ কেন?"

ঝপাং করিয়া ধ্বস্ ভাঙিল।

*　　　　*　　　　*

হিসাব করিয়া দেখিলাম, সাড়ে তিন সেকেণ্ড স্থূলাঙ্গিনী আমার কণ্ঠলগ্না অবস্থায় ছিল। এতদুপলক্ষে আমরা উভয়েই স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মদেহ ধারণ করিয়াছি—কিন্তু স্থূলের স্মৃতিটি আজিও মর্ম্মে হুলের মত বিঁধিয়া আছে।

বিধাতা

বাঘের বড় উপদ্রব। মানুষ অস্থির হইয়া উঠিল। গরু বাছুর, শেষে মানুষ পর্য্যন্ত বাঘের কবলে মারা পড়িতে লাগিল। সকলে তখন লাঠি সড়কি বর্ষা বন্দুক বাহির করিয়া বাঘটাকে মারিল। একটা বাঘ গেল—কিন্তু আর একটা আসিল। শেষে মানুষ বিধাতার নিকট আবেদন করিল—

"ভগবান, বাঘের হাত হইতে আমাদের বাঁচাও।"

বিধাতা কহিলেন—"আচ্ছা।"

কিছু পরেই বাঘরা আসিয়া বিধাতার দরবারে নালিশ জানাইল—"আমরা মানুষের জ্বালায় অস্থির হইয়াছি। বন হইতে বনান্তরে পলাইয়া ফিরিতেছি। কিন্তু শিকারী কিছুতেই আমাদের শান্তিতে থাকিতে দেয় না। ইহার একটা ব্যবস্থা করুন।"

বিধাতা কহিলেন—"আচ্ছা।"

তৎক্ষণাৎ নেড়ার মা বিধাতার নিকট আবেদন পেশ করিলেন—

"বাবা আমার নেড়ার যেন একটি টুক্‌টুকে বউ হয়। দোহাই ঠাকুর, তোমায় পাঁচ পয়সার ছিন্নি দেব।"

বিধাতা কহিলেন—"আচ্ছা।"

হরিহর ভট্টাচার্য্য মামলা করিতে যাইতেছিল। সে বিধাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আজীবন তোমার পূজো করে' এসেছি। উপবাসে দেহ ক্ষীণ করেছি। শালা ভাইপোকে আমি দেখে নিতে চাই। তুমি আমার সহায় হও।"

বিধাতা কহিলেন, "আচ্ছা।"

সুশীল পরীক্ষা দিবে। সে রোজ বিধাতাকে বলে, "ঠাকুর পাশ করিয়ে দাও।" আজ সে বলিল, "ঠাকুর, যদি স্কলারশিপ পাইয়ে দিতে পার, পাঁচ টাকা খরচ করে' হরির লুট দেব—"

বিধাতা কহিলেন—"আচ্ছা।"

হরেন পুরকায়স্থ ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান হইতে চায়। কালী পুরোহিতের মারফত সে বিধাতাকে ধরিয়া বসিল—এগারোটা ভোট আমার চাই। কালী পুরোহিত মোটা রকম দক্ষিণা খাইয়া ভুল সংস্কৃত মন্ত্রের চোটে বিধাতাকে অস্থির করিয়া তুলিল। ভোটং দেহি —ভোটং দেহি—

বিধাতা কহিলেন—"আচ্ছা, আচ্ছা—"

কৃষক দুই হাত তুলিয়া কহিল—"দেবতা, জল দাও—"

বিধাতা কহিলেন—"আচ্ছা"

পীড়িত সন্তানের জননী বিধাতাকে প্রার্থনা জানাইল—"আমার একটি মাত্র সন্তান, ঠাকুর কেড়ে নিও না—"

বিধাতা কহিলেন,—"আচ্ছা।"

পাশের বাড়ীর ক্ষেন্তিপিসি উপরোক্ত মাতার সম্পর্কে বলিলেন—

"বিধাতা, মাগীর বড় দেমাক। নিত্যি নতুন গয়না প'রে ধরাকে সরা জ্ঞান করছিল। ছেলের টুঁটিটি টিপে ধরে বেশ করেছ দয়াময়। মাগীকে বেশ একটু শিক্ষা দিয়ে দাও ত!"

বিধাতা কহিলেন—"আচ্ছা।"

দার্শনিক কহিল—"হে বিধাতা—তোমাকে বুঝিতে চাই।"

বিধাতা কহিলেন—"আচ্ছা।"

চীন দেশ হইতে চীৎকার আসিল—"জাপানীদের হাত হইতে বাঁচাও প্রভু!"

বিধাতা কহিলেন—"আচ্ছা।"

বাঙলা দেশ হইতে এক তরুণ ধরিয়া বসিল—"কোনো সম্পাদক আমার লেখা ছাপিতেছে না। 'প্রবাসী'তে লেখা ছাপাইতে চাই। রামানন্দবাবুকে সদয় হইতে বলুন।"

বিধাতা কহিলেন—"আচ্ছা।"

একটু ফাঁক পড়িতেই বিধাতা পার্শ্বোপবিষ্ট ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার বাসায় খাঁটি সর্ষের তেল আছে?"

ব্রহ্মা কহিলেন—"আছে। কেন বলুন ত?"

বিধাতা। "আমার একটু দরকার। দেবেন কি?"

ব্রহ্মা। (পঞ্চমুখে) "অবশ্য, অবশ্য।"

ব্রহ্মার বাসা হইতে ভাল সরিষার তৈল আসিল। বিধাতা তৎক্ষণাৎ তাহা নাকে দিয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

আজও ঘুম ভাঙে নাই।

তর্ক ও স্বপ্ন

তর্ক হইতেছিল।

প্রথম তার্কিক-প্রাণীটি বলিতেছিলেন, "মাংস আগে ভেজে পরে সিদ্ধ করে নিলে সুস্বাদু হয়।"

দ্বিতীয়টি তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিলেন। বলিলেন—"মাংস আগে ভাজলে সিদ্ধ হওয়া শক্ত। সেজন্য মাংস আগে সুসিদ্ধ হলে পরে ঝোলটা মেরে ভাজা-ভাজা করে নিলেই ভাল হয়। তুমি জান না।"

—"আমি জানি না! মাংস ত ভাজা উচিতই, মশলাও ভাজা উচিত।"

"পাক-প্রণালীতে ওকথা লেখে না!"

"পাক-প্রণালীর কথা রেখে দাও। বড় বড় বাবুর্চির মুখে আমি শুনেছি মাংসটা আগে সিদ্ধ—"

"পাক প্রণালী"র কথা তুমি মানতে চাও না?"

"না।"

"কেন শুনতে পাই কি?"

"কারণ নানা পাক-প্রণালীর নানা মত। সুতরাং বাবুর্চিরা—অর্থাৎ যারা নিত্য রাঁধছে—তাদের কথাই প্রামাণ্য।"

প্রথম তার্কিক একটু থতমত খাইয়া গেলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁহার বুদ্ধি খুলিল।

—"সব বাবুর্চিও ত সব সময়ে একমত নয়।"

"যে সব বাবুর্চিরা মাংস আগে ভাজতে চায়, তারা বাবুর্চি নয়—বেকুব। জাপানে কি করে শুনবে?"

প্রথম তার্কিক ধৈর্য্য হারাইলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন—"জাপান টাপান বুঝি না! তুমি বাবুর্চির অপমান করবার কে? অভদ্র কোথাকার!"

"কি, যত বড় মুখ নয় ততবড় কথা! নিজে দুনিয়ার কোন খবর রাখবে না—আবার ফদর ফদর করে তর্ক করতে আসে! বেকুব!"

"ফের বেকুব বলছ?"

"ক্রমাগত বল্‌ব!—"

"তবে রে—"

—"তবে রে—"

"তর্ক যুদ্ধে পরিণত হইল।

একটি শৃগাল অনতিদূরে বসিয়া তর্কপ্রগতি উপভোগ করিতেছিল; উভয়কে সমরোম্মুখ দেখিয়া হাস্যভরে কহিল—"পুঙ্গবদ্বয়, তোমরা ত উভয়েই নিরামিষ-ভোজী। আমিষ বিষয়ক তর্কে লিপ্ত হইয়া অনর্থক গোলমাল দাঙ্গা করিতেছ কেন? তোমাদের প্রভু জাগরিত হইলে মুসকিলে পড়িবে। শৃগালের কথা তাহারা শুনিল না—পরস্পর শিঙে শিঙ লাগাইয়া ঘোর-নাদে যুদ্ধ করিতে লাগিল।

আচমকা ঘুম ভাঙ্গিয়া গাড়োয়ান দেখিল রাত্রি দ্বিপ্রহরে তাহার বলীবর্দ্দযুগল লড়াই করিতেছে। এবম্বিদ যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে শান্ত করিবার সদুপায় তাহার অবিদিত ছিল না। লগুড় এবং প্রাকৃত ভাষার প্রচুর ব্যবহার সে করিল। তৎপরে গরু দুটিকে পৃথক করিয়া দূরে দূরে বাঁধিয়া সে উপসংহারে কহিল—"খা শালারা খা—বেশী ডেঁপোমি করিস্‌ না!"

খাইতে দিল বিচালি।

* * *

চট্ করিয়া আমার ঘুমটাও ভাঙিয়া গেল! স্বপ্নটাও। যে দুইজন উগ্র প্রকৃতির যুবক জাপান-জার্ম্মানী সংবাদ, হিটলার-মুসোলিনি প্রকৃতি লইয়া তর্কমুখর হইয়া উঠিয়াছিলেন তাঁহারা দেখিলাম নামিয়া গিয়াছেন, ট্রেণ থামিয়াছে, নাথনগরে।

চলচ্ছবি

সুন্দর সুসজ্জিত একটি কক্ষ।

একটি তরুণী বসিয়া সেলাই করিতেছে। কোণে দুগ্ধফেননিভ একটি মার্জ্জার। সেলাই ভাল লাগিল না। পিয়ানো বাজাইয়া গান ধরিল। তাহাও ভাল লাগিল না। অবশেষে টেবিলের উপর একটি ফুলদানিতে ফুল সাজাইতে বসিল। সঙ্গে সঙ্গে গুনগুন করিয়া গান। মুগ্ধ হইয়া গেলাম। ভাবিতে লাগিলাম। আমার মনের কথা কখনও কি তাহার কাছে পৌঁছিবে?

জানিতে পারিলাম তাহার অগণিত প্রণয়ীর মধ্যে দুইজনকে লইয়া সে সম্প্রতি বিব্রত। একজন ধনীর দুলাল, নাদুস্‌নুদুস্‌ ভদ্রলোক। রোজ নানাবিধ উপহার লইয়া বিকশিতদশনে আসিয়া ধর্ণা দেয়। মোটরে বেড়াইতে লইয়া যায়। তরুণীর পিতা ইহাতে আপত্তির কিছু দেখেন না। কারণ তিনি চান এই নাদুস্‌নুদুস্‌ লোকটি তাঁহার জামাই হোক্‌। তাঁহার স্বর্গীয় পত্নীরও এই ইচ্ছাই ছিল এবং মৃত্যুকালে তাঁহার অনুরোধেই এই তন্বী রূপসী ওই নাদুস্‌নুদুস্‌কে বিবাহ করিতে রাজী হইয়াছিল। মৃত্যুশয্যায় শায়িতা জননীর শেষ ইচ্ছা পালন করিতে কে না চায়?

নাদুস্‌নুদুস্‌ লোক ভাল, টাকা কড়ি আছে, কুরূপও নয়, স্বাস্থ্য

ভালই—কিন্তু! তরুণীটি নানাদিক হইতে চিন্তা করিয়া দেখে। 'কিন্তু'কে ঠেকান যায় না। সেদিন দুরন্ত ছুটন্ত পাগলা ঘোড়ার সম্মুখীন হইয়া নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া যে সুশ্রী যুবকটি তাহাকে বাঁচাইয়াছিল নাদুস্‌নুদুস্‌ মোটেই তাহার মত নয়।

সেই নামগোত্রহীন দুঃসাহসী যুবাকে সমস্ত নারীহৃদয় দিয়া সে চায়।

নাদুস্‌নুদুস্‌ কিন্তু না-ছোড়!

তরুণী তাহাকে তাড়াইয়া দিতেও পারে না। জননীর শেষ-ইচ্ছা। জননীর মৃত্যু-ছায়াচ্ছন্ন শীর্ণ মুখখানি মনে পড়ে। নাদুস্‌নুদুস্‌কে কিছু বলিতে পারে না।

অথচ সেই যুবক!—যুবকটির পরিচয় সে পাইয়াছে। সে এক জমিদার বাড়ীর সহিস। হোক সহিস—সে সুশিক্ষিত। সেকস্‌পিয়র হইতে গলস্‌ওয়ার্দ্দি এমন কি আরলেনের পর্য্যন্ত খবর রাখে সে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। দেশের মুকুটমণি হইতে পারিত—শুধু কপালের দোষে সে আজ সহিস মাত্র।

সর্ব্বোপরি সুন্দর এবং সুপুরুষ। বলিষ্ঠ সতেজ বিদ্রোহী। যদিও সামান্য সহিস—কিন্তু মুখে হাসি ঝলমল করিতেছে—চোখে অহীন-দীপ্তি!

আমি দমিয়া গেলাম।

সত্যই ত, একদিকে নাদুস্‌নুদুস্‌ আর একদিকে ওই সর্ব্বগুণান্বিত সহিস ছোক্‌রা—ইহারা মধ্যে আমার মত নগণ্য লোকের স্থান কোথায়? একমাত্র সম্বল ছাঁটা গোঁফ-জোড়াটায় হাত বুলাইতে বুলাইতে চিন্তা করিতে লাগিলাম।

এমন সময় এক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। ইতিপূর্ব্বে দু-একবার

তরুণীটি ও সহিস-যুবকটি সহরের বাহিরে যে পুলটা আছে তাহারই উপর গোপনে সন্ধ্যায় দেখাশোনা করিয়াছে। একদিন চুম্বন-বিনিময়ও হইয়াছিল! কিন্তু সেদিন যাহা ঘটিল তাহা সত্যই রোমাঞ্চকর!

গভীর রাত্রি। সহিস ছোকরাটি এক প্রকাণ্ড ঘোড়ায় চড়িয়া হাজির। ব্রাউন রঙের বিশাল ঘোড়া ঘাড় বাঁকাইয়া ছুটিয়া আসিল।

তরুণীটির বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া 'হুইসল্' দিতেই তরুণী পথে নামিয়া আসিল। ক্ষণিকের জন্য তাহার মায়ের শেষমুখচ্ছবি স্মৃতিপটে ভাসিয়া উঠিল। কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্যই। অবলীলাক্রমে সহিস তাহাকে অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া লইল। তাহার পর—

—টগবগ টগবগ টগবগ!

ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আমার রক্তও যেন ফুটিতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরে নাহুসনুহুসও টের পাইল! যখন সে সত্যই বুঝিল যে প্রেয়সী প্রণয়-শৃঙ্খল কাটিয়া পলাইয়াছে তখন তাহার মুখভাব একটা দেখিবার মত জিনিস! প্রতারিত নাহুস্নুহুস্, বিরহী নাহুস্নুহুস্, উন্মাদ নাহুসনুহুস্! সে কি চেহারা। মোটর লইয়া পথে বাহির হইতেই একজন বৃদ্ধা তাহাকে বলিয়া দিল কোনপথে তাহারা গিয়াছে। প্রকাণ্ড 'রোলস্ রয়েস্' সেই পথে ছুটিল। উদভ্রান্ত নাহুসনুহুস্ 'ষ্টিয়ারিং' ধরিয়া বসিয়া আছে। ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, গাড়ীর বেগ বাড়িয়া চলিয়াছে। ফরফর করিয়া মাথার চুল উড়িতেছে।

সে কি প্রাণান্তকর অনুধাবন। নক্ষত্রবেগে ঘোড়া মাঠ,বন,অরণ্য, পর্ব্বত পার হইয়া যাইতেছে—বিদ্যুৎবেগে নাহুসনুহুস অনুসরণ করিতেছে। প্রায় ধরে ধরে—এমন সময় সম্মুখে এক নদী। এক

লম্ফে অশ্ব নদী পার হইয়া গেল। নাদুসনুদুসের রোলস্ রয়েস্ পারিল না। ষ্টিয়ারিং ছাড়িয়া নাদুসমুদুস আক্রোশে দুই হাতে চুলের মুঠি চাপিয়া ধরিল।

—ঝপাং।

নাদুসনুদুস্ জলে লাফাইয়াছে। কিন্তু সাঁতার জানে না। খরস্রোতা পাহাড়ী নদী। স্রোত ভীষণ। প্রাণপণে তবু চেষ্টা করিতে লাগিল সে। সহজে ছাড়িবে না। নাকে মুখে চোখে জল ঢুকিয়া, প্রবল স্রোতে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া নাকানি-চোবানির চরম হইল। তবু ছাড়িবে না। কি অমানুষিক আপ্রাণ চেষ্টা! এমন না হইলে প্রেম! সমস্ত আত্মা দিয়া, সমস্ত সত্ত্বা দিয়া নাদুসনুদুস ওপারে যাইতে চায়।

প্রিয়তমা যে ওপারে আততায়ীর হস্তে!

নাদুসনুদুস আর পারে না। বোধশক্তি হারাইয়া যাইতেছে—হস্ত পদ ক্লান্ত অবসন্ন। সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া আসিল। নাদুসনুদুস বুঝি তলাইয়া গেল।

... ...

সেই সময়ে ঠিক ওপারে একটি গিরিশৃঙ্গে দাঁড়াইয়া সহিস ছোকরাটি ও তরুণীটি আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছে মেঘের স্তর ভেদ করিয়া চাঁদ উঠিতেছে।

হঠাৎ সহিসের নজরে পড়িল নীচে নদীতে কে যেন ডুবিতেছে। সঙ্গিনীকে কহিল, "দেখ, কে যেন ডুবছে—ওকে তুলি।"

তরুণী কহিল—"ও কিন্তু নাদুসনুদুস।" সহিস সামান্য লোক নয়। মহামানব সে। সে হাসিয়া কহিল—"তা আমি জানি; হোক্ নাদুস-

নুহুস কিন্তু মানুষ ত! সে ডুববে আর আমি দাঁড়িয়ে দেখব। হতে পারে না।" তীর-বেগে ঘোড়ায় চড়িয়া তরতর করিয়া পাহাড় হইতে নামিয়া গেল সে।

খানিকক্ষণ পরে দেখা গেল নাহুসনুহুসের দেহ স্কন্ধে বহিয়া সহিস হাঁটিয়া পাহাড়ে উঠিতেছে। সংজ্ঞাহীন বিশালকায় ভিজা নাহুস-নুহুসকে লইয়া পাহাড়ে চড়া! কি কষ্ট! সহিসের মুখে দেবতার দীপ্তি—দেহে দৈত্যের বল!

ঘোড়াটি মন্ত্রমুগ্ধের মত পিছু পিছু আসিতেছে।

তাহার পর দুই জনে মিলিয়া নাহুসনুহুসের কি সেবাটাই করিল! সহিস তাহার একমাত্র কম্বলে তাহাকে ঢাকিয়া দিয়া নিজে শীত ভোগ করিতে লাগিল।

তরুণী তখন কহিল—"প্রিয়তম তুমি সহিস নও—তুমি দেবতা।" কম্বলের ভিতর হইতে নাহুসনুহুস বলিল—"ঠিকই বলিয়াছ। কিন্তু এখন ঘুমাও।

ঘুমাইতে ঘুমাইতে তরুণী স্বপ্ন দেখিতে ছিল। তাহার মা যেন বলিতেছেন—"বৎসে, তুমি যোগ্যতমকেই বিবাহ কর—ইহাই আমার পুনশ্চ ইচ্ছা।"

ঘুম ভাঙিয়া দেখিল—সম্মুখে বৃক্ষশাখায় একজোড়া কপোত কপোতী চঞ্চু চুম্বন করিতেছে। পাশ ফিরিয়া দেখিল—নাহুসনুহুস জাগিয়া বসিয়া আছে। নাহুসনুহুস আবেগভরে কহিল, "দেখ, তুমি এই সহিসেরই উপযুক্ত। আমাকে এখন কেবল নদীটা পার করিয়া দাও। ঈশ্বর তোমাদের সুখী করুন।"

তরুণী কহিল—"ধন্যবাদ। আপনাকে উনি নিশ্চয়ই নদীপার করিয়া দিবেন। ওঁকে জাগান।"

নাহুসনুহুস্ দেখিল অদূরেই সহিস অঘোরে ঘুমাইতেছে। ডাকিল, সাড়া নাই। ঠেলিল, সাড়া নাই। সহিস জ্বরে অচৈতন্য।

তখন সে অগত্যা একাই পাহাড় হইতে নামিতে লাগিল। কাপড় তখনও ভিজা—সর্ব্বাঙ্গ কাদা—মুখে নিরাশা।

হতাশ প্রণয়ী নাহুসনুহুসের সে কি করুণ অবরোহণ !

সিনেমা শেষ হইয়া গেল। পথ চলিতে চলিতে বুকের ভিতরটা কেমন যেন করিতে লাগিল। কি আর করি। অগত্যা পোড়া বিড়িটা কান হইতে নামাইয়া ধরাইয়া ফেলিলাম।

বর্ষা-ব্যাকুল

ঘন-ঘোর করিয়া আসিয়াছে।

সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া নিবিড় কালো মেঘ থম্ থম্ করিতেছে। আকাশ চিরিয়া বিদ্যুতের আলো। পূরবী বাতাসের বেগ বাড়িয়া উঠিতেছে।

মনটা বিকল হইয়া গেল। বাতায়ন পথে আকাশের অনেকখানি দেখা যায়। বিছানায় উপুড় হইয়া উদ্বেলিত চিত্তে অবশ্যম্ভাবী বর্ষা সমাগম প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কি ঘন ঘটা···। খবরের কাগজটা খুলিয়া দেখিলাম। অস্বস্তি বাড়িয়া গেল। কালিদাসটা কোথা ?

গুরু গুরু গুরুগুরু— আকাশ ডাকিল।

"কেষ্টা—অ কেষ্টা !"

কেষ্টা চাকর আসিল। তাহাকে কহিলাম—"ওরে বৃষ্টি আস্‌ছে। কড়া এক কাপ চা নিয়ে আয় ত। আর দেখ এক বাণ্ডিল বিড়িও আনিস্।"

বাতায়ন পথে দেখিলাম ঘনকৃষ্ণ মেঘমালা ঘনতর হইয়া আসিয়াছে। কালিদাসকে চাই। কালিদাস না হইলে জমিবে না। আসিলেন কিন্তু ভজহরিবাবু। তাঁহার সম্মুখের দন্ত কয়েকটি সর্ব্বদাই প্রকাশিত। আমাদের ম্যানেজার তিনি।

"সহায়রামবাবু, আপনার একখানা চিঠি এসেছে আজ"।

চিঠি দিয়া ভজহরিবাবু চলিয়া গেলেন।

প্রিয়ার পত্র। বহুকাল পরে। বুকটা যেন কাঁপিয়া উঠিল। আকাশ নিবিড় হইয়া আসিল। চিঠিখানি খুলিয়া আদ্যোপান্ত পড়িলাম। আর একবার পড়িলাম। আবার একবার!

সমস্ত মনটা উদাস হইয়া গেল। কেষ্ট চা আনিল। একটু একটু চা পান করিতে করিতে প্রিয়ার পত্রখানি চতুর্থবার পাঠ করিলাম। আকুলতা বাড়িল বই কমিল না!

আকাশের ঘনায়মান আয়োজন আমাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছে। নীরব অন্ধকার!

টপ্ টপ্ টিপ টাপ্—বর্ষণ সুরু হইল।

হাত ঘড়িটার পানে চাহিয়া দেখিলাম—পৌনে দশটা। সমস্ত মন প্রাণ বিচলিত। এখন যদি...নাঃ! পাশের বাড়ীর গ্রামোফোন হইতে অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে ইন্ধন জোগাইতে লাগিলেন।

"রতন পালংপর বৈঠল দুঁহু জন..." সমস্ত আকাশ উদ্ভাসিত করিয়া বিদ্যুৎ ঝলসিয়া গেল।

কড়—কড়—কড়—কড়াৎ

আর পারি না। অন্তরের সমস্ত আবেগ ভাষায় রূপান্তরিত করিলাম—"কালিদাস রাস্কেলটা গেল কোথায়?"

সঙ্গে সঙ্গে কালিদাস আপাদ মস্তক ভিজিয়া হুড়মুড় করিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

"উঃ, কি বৃষ্টি মাইরি!"

"কি বৃষ্টি মাইরি! সেই থেকে তোর জন্য বসে আছি। আমাদের জাতটা এই জন্য উচ্ছন্ন গেল! সময়ের একটা জ্ঞান নেই! ক্যাড্ কোথাকার! এখন কি করে যাই বল ত? না আছে একটা ছাতা, না আছে ওয়াটারপ্রুফ!"

কালিদাস অপ্রতিভ হইয়াবলিল—"হঠাৎ বৃষ্টিটা নামতেই আট্কে পড়লুম ভাই।"

"আজই কি শেষ?"

"হ্যাঁ, আজই শেষ।"

"ছি ছি মাইরি গ্রেটা গার্বোর অমন ছবিটা দেখ হল না। দশটা বেজে গেছে।"

প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন মানসে কালিদাস কহিল—"তোর হাতে ওটা কি?"

"বৌ• চিঠি দিয়েছেন। তাঁর জ্বর, বড় মেজ সেজ ছোট্ট ন—সব ছেলেগুলির জ্বর। মেয়ে দুটার আমাশা হয়েছে। সে যাক গে। গ্রেটা গার্বোর লভ্ সিনটা মাইরি দেখা হল না।—এ দুঃখ রাখি কোথা—"

নিস্ফল আক্রোশে মুষলধারার প্রতি চাহিয়া রহিলাম। পাশের বাড়ীতে গান চলিতে লাগিল—রসভরে দুহুঁ তনু—থর থর কাঁপই—"

পূজোর গল্প

গল্প শুনিতে চান ত ? শুনুন তবে।

সেবার পূজার দুইএকদিন আগে সিমলা হইতে ফিরিতেছিলাম। আমি ইন্‌সিওরেন্‌সের দালাল। কার্য্য-ব্যপদেশে নানাস্থানে গতিবিধি ! যে 'লাইফ'টির জন্য গিয়াছিলাম—তাহা লইতে পাই নাই! অন্য আর একজন সেটি বাগাইয়া লইয়াছে। সুতরাং মন খারাপ ছিল।

যে কামরায় উঠিলাম তাহাতে দেখি অপরূপ সুন্দরী—একজন নয়—তিন তিন জন। চোখ ঝলসাইয়া গেল। সঙ্গে একটি যুবক আছেন। তিনিও কন্দর্পকান্তি। আমার এই মেদবহুল কৃষ্ণবপু লইয়া ইহাদের নিকটে বসিতে লজ্জা করিতে লাগিল। তবু বসিলাম। খানিকক্ষণ পরে যুবকটিকে সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিলাম "কত দূর যাবেন ?" তিনি দেখিলাম একটি সিনেমা সাপ্তাহিকে নিবদ্ধদৃষ্টি—একটি অভিনেত্রীর অর্দ্ধনগ্ন চিত্র তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে।

"কত দূর যাবেন ?"

চকিত হইয়া যুবকটি বলিল—"কি বলছেন ?"

"কতদূর যাবেন তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

"বঙ্গদেশ।"

"আমিও ত সেখানেই যাচ্ছি। একসঙ্গে যাওয়া যাবে বেশ"—যুবকটি দেখিলাম—আবার সাপ্তাহিকে মন দিয়াছেন !

সাপ্তাহিকটিতে আমাদের কোম্পানির একটি বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে দেখিলাম। যুবকটির চিত্ত সেই দিকে আকর্ষণ করিবার আশায় কহিলাম—"এই বিজ্ঞাপনটা আমাদের কোম্পানির—আমরা যত বোনাস্ দিই—"

অর্দ্ধনগ্ন অভিনেত্রীর দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া যুবকটি বলিলেন—"ওসব বুঝি না।"

"বোনাস্‌ বোঝেন না! আপনি ইন্‌শিওর্ড ত?

"ওসব বুঝি না! যা বুঝি তা দেখছি।" বলিয়াই আবার সেই চিত্রের দিকে চাহিলেন। আমি বিষ্ণুচরণ বর্ম্মা—ছাড়িবার পাত্র নহি। বলিলাম "আপনার মত রসিক লোক জীবন-বীমা বোঝেন না এটা বিশ্বাস করা শক্ত। মাসে সামান্য কিছু অর্থব্যয় করে যদি জীবনটাকে"—

বাধা দিয়া যুবক কহিলেন—"অনর্থক অর্থের কথা পেড়ে আমাকে বিব্রত করবেন না। বৈষয়িক যদি কিছু আলোচনা ক'র্‌তে চান মায়ের সঙ্গে করুন।"

সহাস্য নমস্কারে তাঁহার জননীর সম্বর্দ্ধনা করিলাম। বলিলাম—"আপনার ছেলে তো এ বিষয়ে আলোচনা ক'র্‌তেই চান না। আপনি নিশ্চয় আমার সঙ্গে একমত যে, জীবন-বীমা জিনিসটা সকলের পক্ষেই অবশ্য কর্ত্তব্য।"

মহিলাটি সমস্ত মুখে স্নিগ্ধ হাসির আভা ছড়াইয়া বলিলেন—"আমিও কিন্তু ও বিষয়ে বিশেষ কিছু জানি না; আপনার অসুবিধা না হয় ত একটু বিশদ করে বলুন।"

"নিশ্চয়ই"—বলিয়া সুরু করিলাম এবং অনর্গল আমাদের সম্মোহন-মন্ত্রগুলি সগর্ব্বে আওড়াইয়া গেলাম। কিন্তু আশ্চর্য্য—মহিলাটির মনে রেখাপাত পর্য্যন্ত করিল না। অন্য দুইটি মহিলাও আমার বক্তৃতা মন দিয়াই শুনিলেন—কিন্তু তাঁহাদেরও কোন উৎসাহ দেখিলাম না।

একটু থামিয়া বলিলাম—"আশা করি আমার সব কথা আমি স্পষ্ট করে বোঝাতে পারছি!"

প্রথম মহিলাটি বলিলেন, "হ্যাঁ, অস্পষ্ট কিছু নেই। কিন্তু আমার দরকার হবে না জীবন-বীমার।"

"আপনার না হয় না হতে পারে—কিন্তু আপনার পুত্রের, আপনার স্বামীর ?"

"আমার স্বামী মৃত্যুঞ্জয়। সুতরাং তাঁর জীবন-বীমার প্রয়োজন কই ?"

এমন সময় বাঙ্কের উপর হইতে স-শুণ্ড মুণ্ড বাহির করিয়া গুরু-গম্ভীর কণ্ঠে গণেশ কহিলেন—"তোমরা বড় গোলমাল করছ মা! এ চারদিন কি আর নিদ্রা হবে ? একটু ঘুমিয়ে নাও না—"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখিলাম—এ কি! ভ্রম বুঝিতে পারিলাম। জগজ্জননী দুর্গা বঙ্গদেশে চলিয়াছেন—সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী কার্ত্তিক গণেশ। সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া পদধূলি লইলাম। বলিলাম—"অবোধ আমি—ক্ষমা চাই।" শঙ্করী হাসিয়া বলিলেন—কোন দোষ ত কর নাই বৎস। ফর্ম্ম বাহির কর—বঙ্গদেশে পূজাটা ইন্‌শিওর করিয়া রাখি। তোমার বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়াছি।"

বল হরি, হরি বোল

"বল হরি, হরিবোল"

নৈশ গগন মুখরিত করিয়া আমরা কয়জন প্রাণী চলিয়াছি। হঠাৎ রমেশবাবু আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"আপনার নিশ্চয় খুব রাগ হচ্ছে আমার উপর।"

আমি বলিলাম—"না—কিছুমাত্র না।"

রমেশবাবু বলিতে লাগিলেন—"না হওয়াটাই আশ্চর্য্য। আজ

বিকেলে আপনি আমার বাড়ীতে অতিথি হলেন। রাত্রে আপনাকে মড়া বইতে নিয়ে যাওয়াটা ভদ্রোচিত নয়। কিন্তু লোক জুটল না— কি করি বলুন।"

আমি বলিলাম—"আহা, ওর জন্য আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? কলেজে পড়ার সময় মড়া পোড়ানটাও আমাদের কোর্সের মধ্যেই ছিল প্রায়। প্রায়ই এ কার্য্য করতে হত।"

হরেন্দ্রবাবু তখন বলিয়া উঠিলেন, "ওসব বাজে ভদ্রতা ছেড়ে এখন কেউ একটা মিঠে গোছের প্রেমের গল্প বলুন দেখি—সময়টা যাতে কাটে। এখনও বেশ কিছু দূর হেঁটে যেতে হবে। শ্যামবাবু, আপনি বলুন।"

শ্যামবাবু আমাদের মধ্যে একটু বয়স্ক লোক। তিনি বলিলেন— "আরে বাপু—দু একটা প্রেম যা জীবনে করেছি তা' কি আর এখন মনে আছে? আমাকে এখন অ্যালজাব্রার ফর্ম্যুলা জিজ্ঞেস করাও যা, প্রেমের গল্প বলতে বলাও তাই। এককালে করেছি সব। কিন্তু কিছুই ভাল মনে নেই। এখন আমার প্রধান চিন্তা, তোমাদের পাল্লায় পড়ে এলাম ত—বাতটা না বাড়ে।"

"বল হরি, হরি বোল—"

হরেন্দ্র তখন শ্যামবাবুকে ছাড়িয়া চন্দ্রবাবুকে ধরিয়া পড়িলেন। "আপনি ত চন্দর-দা এককালে খুব উড়েছিলেন। বলুন না দু' একটা গল্প—সময়টা কাটুক।"

"বল হরি, হরি বোল"

চন্দ্রবাবু বলিলেন—"উড়েছিলাম বটে। কিন্তু ঠিক যে প্রেম করেছিলাম তাতো বলতে পারি না। কারণ each time, I had to pay for my love either in coins or in kinds! সুতরাং

তার সম্বন্ধে বিশেষ কোন কবিত্ব নেই মনের মধ্যে। রাণী, হাবি, বিনোদিনী, নয়নতারা সব একাকার হয়ে গেছে! Distinguish করা শক্ত।"

"বল হরি, হরি বোল।"

হরেন্দ্রবাবু রমেশবাবুকে তখন বলিলেন—"আপনার ষ্টকে কিছু আছে নাকি রমেশ দা? ছাড়ুন না—"

রমেশবাবু হাসিয়া উঠিলেন—"আমি ভাই ইস্কুলে পড়ামুখস্থ করে একজামিন পাস করাটাই পরমার্থ মনে করতাম। সুতরাং ছাত্রজীবনে পরীক্ষা পাস করা ছাড়া আর কিছু করি নি। বিয়ে করে স্ত্রীর প্রেমে পড়েছিলাম। ফলে চারটি মেয়ে হয়েছে দেখতে পাচ্ছ।"

"বল হরি, হরি বোল"

একটু থামিয়া রমেশবাবু আবার বলিলেন—"এইবার একটা প্রেম করব মনে করছি! কিন্তু অবসর কই? সকাল থেকে উঠে আপিস যাওয়ার তাড়া। সন্ধ্যে বেলা ফিরে এসে মনে হয় চাট্টি খেয়ে শুতে পারলে বাঁচি। তোমার নিজের কিছু থাকে ত বল না ভায়া। অপরকে জ্বালাতন কর কেন?"

"বল হরি, হরি বোল"

হরেন্দ্রবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন,—"ডাক্তারেরা যেদিন থেকে আশঙ্কা করলেন যে, আমার বুকের দোষ আছে—সেদিন থেকে জীবনকে আর কারুর সঙ্গে জড়াতে সাহস পাই না। তা ছাড়া আমার মত মুখে বসন্তের দাগ—একচোখকাণা লোককে কোন্ মেয়ে ভালবাসবে বলুন! কিন্তু প্রেমের গল্প শুনতে আমার ভারি ইচ্ছে। বলুন না আপনারা কেউ একটা।"

"বল হরি, হরি বোল"

তারপর হঠাৎ আমার দিকে ফিরিয়া হরেন্দ্রবাবু বলিলেন, "কিছু মনে করবেন না মশাই। আপনি অপরিচিত লোক। জীবনে যদি ঘটে থাকে কিছু বলুন না। সময়টা কাটুক।"

"বল হরি, হরি বোল"

আমার জীবনে যে রমণীর আবির্ভাব ঘটে নাই তা নয়। কিন্তু তাহা বলিতে লজ্জা করে। সুতরাং কথাটা ঘুরাইয়া বলিলাম, "এখন কি ওসব ভাল লাগবে? তার চেয়ে বরং ভূতের গল্প বলুন কেউ।"

বয়স্থ শ্যামবাবু বলিলেন—'প্রেমের গল্প আর ভূতের গল্প আমার কাছে দুইই সমান। আপনি প্রেমের গল্পই বলুন।"

"বল হরি, হরি বোল"

বলিতে লাগিলাম।

"তখন সবে আমি এম, এ, পাস করেছি। বেশী দিন নয়, বছরখানেক আগেকার কথা। মামার বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিলাম। হঠাৎ সেখানে এক অশিক্ষিতা চাক্‌রাণীকে ভাল লেগে গেল। বয়স কম। কিন্তু ভারি সুন্দর। খোঁজ করে শুনলাম মেয়েটি বিধবা। অমন নিষ্পাপ মূর্ত্তি আমি কখনো দেখি নি।"

"বল হরি, হরি বোল"

"তারপর ক্রমশঃ যেমন হয়। একদিন আড়ালে পেয়ে তাকে প্রেম নিবেদন করলাম। মেয়েটি শুধু বললে—'তা কি হয়?'

আমি তাকে বুঝিয়ে দিলাম "খুব হয়"। বলে' একটা আধুলি বার করে তার হাতে দিতে গেলাম। সে কিছুতে নিলে না।"

"বল হরি, হরি বোল"

"এমনি করে কিছুদিন গেল। যতদিন মামার বাড়ীতে ছিলাম তার আশেপাশে ঘুরেছি। কিন্তু কিছুই সুবিধা করে উঠতে পারি নি।

মামা, মামী, বাড়ীসুদ্ধ লোকজন। একদিন লুকিয়ে তার বাড়ী গেলাম। সেখানেও দেখি এক খাণ্ডার মাসী রয়েছে। বড় অস্বস্তির মধ্যে দিন কাটতে লাগল। হঠাৎ একদিন সুযোগ পেয়ে গেলাম। মুকুজ্জেদের বাড়ী মামামামী বাড়ীসুদ্ধ লোকের নেমন্তন্ন হল। ফাঁকা বাড়ী। কুসুমকে সেদিন একা পেলাম।"

হরেন্দ্রবাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"বল হরি, হরি বোল"

"সেই দিনই বুঝলাম, কুসুমও আমাকে ভালবাসে। সেইদিনই তার সেই চকিত চাহনি আর ঠোঁটের কাঁপন দেখে আমি বুঝেছিলাম যে আমার স্বপ্ন সফল হয়েছে। সেদিন তাকে আমি যা-ইচ্ছা তাই করতে পারতাম। কিন্তু কেন জানি না, কিছু করতে পারলাম না। শুধু একটি চুমু খেলাম।"

"বল হরি, হরি বোল।"

আমার আর কিছু বলিবার ছিল না।

হরেন্দ্রবাবু বলিলেন, "তারপর?"

"তারপর? তারপর আর কিছু নেই। জানাজানি হয়ে যাওয়ার ভয়ে আমি পালিয়ে এলাম। কুসুমের আর দেখা পাই নি, শুনেছিলাম আমি চলে আসার পর সে-ও মামার বাড়ীর কাজ ছেড়ে দিয়েছে।"

"বল হরি, হরি বোল"

শ্মশানে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। শব নামান হইল। চিতা সাজান হইল। শবের দেহাবরণ খুলিয়া তাহাকে চিতায় তুলিবার সময় বলিয়া উঠিলাম—

"থামুন—থামুন—থামুন—এ আপনার বাসায় কি করে এলো রমেশবাবু?"

রমেশবাবু বলিলেন—"অসুস্থ হয়ে এই মেয়েটি দুদিন আগে

আমাদের গোয়ালঘরে আশ্রয় নিয়েছিল। বলেছিল, কাকে খুঁজতে সে বেরিয়েছে। তাছাড়া অত প্রশ্ন করার অবসর ছিল কোথায়? বেচারী মারাই গেল। কেন বলুন ত?"

স্তব্ধ হইয়া রহিলাম।

ট্রেনে

ট্রেনে এক বৃদ্ধ চলিয়াছেন। বৃদ্ধ হইলেও লোকটি যে এককালে সৌখিন ছিলেন তা বেশ বোঝা যায়। মাথার চুল হইতে আরম্ভ করিয়া পায়ের মোজাটা পর্য্যন্ত তাঁহার বিগত-যৌবনের রুচির পরিচয় দিতেছে। হাতে একটি মোটা বর্ম্মা চুরুট। খবরের কাগজে নিবদ্ধদৃষ্টি।

তিনি কামরাটিতে একাই ছিলেন। কিউল ষ্টেসনে ট্রেন থামিতে একটি উনিশ-কুড়ি বৎসর বয়সের যুবক আসিয়া সেই কামরায় উঠিল।

যুবকটির ঘাড় চাঁছা, গোঁফ ছাঁটা, চোখে শস্তা দামের খেলো নীল চশমা—পরনে চুড়িদার পাঞ্জাবি, পাঞ্জাবির অন্তরালে গোলাপি গেঞ্জি, মুখে বিড়ি, বগলে একটি মাসিক পত্র। আসিয়াই বেঞ্চি বাজাইয়া গান ধরিয়া দিল—"কে বিদেশী মন উদাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে—"। তারপর বৃদ্ধের দিকে তাকাইয়া বিড়িটা ধরাইতে ধরাইতে একমুখ হাসিয়া প্রশ্ন করিল—"আপনার কত দূর যাওয়া হবে স্যার—"

বলা বাহুল্য, বৃদ্ধ বিরক্ত হইয়াছিলেন। সংযতকণ্ঠে তথাপি উত্তর দিলেন—"দানাপুর যাব। আপনি?

"তবে বেশ ভালই হল—আমিও দানাপুরেই যাব। তাহলে আমার

স্যার এই পুঁটুলি আর বইটা রইল। আমি চট্‌ করে এক কাপ চা খেয়ে আসি। আর বিড়িও আনি এক বাণ্ডিল।"

অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিল। মুখে বিড়ি। কিছুক্ষণ কোন কথা-বার্ত্তা নাই। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি হাতের খবরের কাগজটা নামাইতেই যুবকটি হাত বাড়াইল—"কাগজটা একবার পেতে পারি স্যর—"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাগজটা দিতে হইল।

একটু পরেই যুবকটি বলিয়া উঠিল—"ইস্‌—একটি ছোক্‌রা আত্মহত্যা করেছে দেখছি প্রেমে পড়ে'—"

বৃদ্ধ যেন ওৎ পাতিয়া বসিয়া ছিলেন। সশব্দে ঝালটা ঝাড়িয়া দিলেন—"আজকালকার এই গোঁফ-ছাঁটা ছোঁড়াগুলোকে দেখলে গা জ্বলে' যায়।"

যুবকটি কিছুমাত্র না চটিয়া পানের ছোপ-ধরা দাঁত বাহির করিয়া হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"আপনাদের ছোক্‌রা কালে কি আপনারা প্রেম করেন নি? সব যুধিষ্ঠির ছিলেন?"

বৃদ্ধ বলিলেন—"যুধিষ্ঠির হয়ত ছিলাম না। কিন্তু বেয়াদপ ছিলাম না। বুড়ো লোকের সম্মান রেখে কথা কইতাম।—"

ছোক্‌রা দমিবার নহে। আবার হি হি করিয়া হাসিয়া বলিল, "আপনারাও প্রেম করতেন তাহলে—"

বৃদ্ধ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিলেন। খানিকক্ষণ পরে বলিলেন, "আপনার হাতে ওখানা কি কাগজ? দেখি একবার—"

"হাঁ হাঁ স্যর দেখুন। ওতে বেশ একটা ভাল গল্প আছে, পড়ে দেখুন। 'মগডালে' পড়ে দেখুন—"

বৃদ্ধ মাসিকটির আদ্যোপান্ত উল্টাইয়া "মগডালে" পড়িতে সুরু করিলেন। লেখকের নাম নাই। বৃদ্ধ পড়িতে পড়িতে বর্ম্মাতে দুটো টান দিয়া বুঝিলেন—ধরাইতে হইবে। দেশলাইটা কোথা গেল? এ পকেট সে পকেট খুঁজিতেছেন এমন সময় যুবকটি চট্‌ করিয়া নিজের দেশলাইটা হইতে ফস্‌ করিয়া একটা কাঠি জ্বালাইয়া বলিল—

"এই যে আসুন স্যর—"

"Thanks"

"কেমন লাগছে স্যর গল্পটা—?"

"একেবারে ট্রাশ। শেষ হলে বাঁচি।"

"শেষের দিকটা দেখবেন—রস আছে।"

"দেখা যাক্‌—"

"বাগানের দৃশ্যটা কেমন লাগল?"

"বেশ অদ্ভুত। তবে কোন জিনিসই শেষ পর্য্যন্ত না পড়ে কিছু বলা যায় না—"

যুবক কিছু না বলিয়া আর একটি বিড়ি ধরাইয়া গান ধরিল—

ফুল বাগানে ঝুলবি যদি আয়
এই ভরা জ্যোছনায়—

বৃদ্ধ পড়িয়া চলিয়াছেন—। বাহিরে জ্যোৎস্নায় ফিনিক্‌ ফুটিতেছে।

গল্প শেষ হইলে বৃদ্ধ বলিলেন—"একেবারে বাজে—"। যুবক বলিয়া উঠিল—"কেন শেষকালটায়—যেখানে মণিমালা কদম গাছের মগডালে উঠে বসে আছে। আর নায়ক ভুলে মনে করছে যে সে তালপুকুরে ডুবে গেছে—আর সেই ভেবে ক্রমাগত-সাঁতার দিয়ে খুঁজছে। সেখানটা ভাল লাগল না আপনার?"

"রাবিশ—! আজকাল ছেলেরা বোধ হয় সত্যিকার মেয়েমানুষের সন্ধান পায় না—"

"তার মানে ?"

"তা না হলে ওই রকম গল্প লেখে কেউ! এই সত্যি কথাটা কেউ বুঝছে না যে যাকে স্বর্গের দেবী বলে বলে সবাই অস্থির হচ্ছে—she can be easily bought !"

"সেটা কি সব ক্ষেত্রে সম্ভব—"

"প্রায় ক্ষেত্রেই—অন্ততঃ আমার তাই ধারণা।"

"কি রকম বলুন না—"

"এই ধর একটা concrete example দিচ্ছি। আমারই ছেলেবেলায় প্রায় বছর কুড়ি আগে সৈরভি বলে একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম হল—তার গর্ভে একটা ছেলেও হল! ছেলেটা যখন মাস ছয়েকের, তখন ব্যস্, মাগী একদিন উধাও। শুনলাম তিনি রামেশ্বর পুরের জমিদারের প্রেমে পড়েছেন! আমি আর ও নিয়ে বিশেষ কোন মাথাই ঘামালাম না। I had another—girls were so cheap in those days" যুবক মুখ হইতে বিড়িটা ফেলিয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

তাহার পর যুবক বিনীত স্বরে বলিল—"আমায় মাপ করবেন। না জেনে হয়ত আপনার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেছি।"

"মানে ?"

"মানে সৈরভি আমারই মা—তিনি এখনও রামেশ্বরপুর জমিদার বাড়ীতে চাকরাণী আছেন। আপনি, আমার বাবা—"

এই বলিয়া সে প্রণত হইয়া বৃদ্ধের পদধূলি লইল।

তাহার পর হঠাৎ বলিল—"আচ্ছা, আপনার নাম কি হারাধন বসাক ?"

"আমার নাম রমেশ সেন—"

"ও, যাক্। তবে আপনি নন্। মায়ের মুখে শুনেছি আমার বাবার নাম হারাধন বসাক। তাহলে আপনার একটা চুরুট দিন স্যর। আমার বিড়ি গেছে ফুরিয়ে—বাঁচালেন আপনি।"

বলিয়া ছোক্‌রা হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

সনাতনপুরের অধিবাসীবৃন্দ

১

প্রবীণ মোক্তার শৈলেশ্বরবাবু হঠাৎ নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছেন। ইহাই যথেষ্ট উত্তেজনার কারণ। খবরের কাগজে ছবি ছাপাইয়া, সভা-সমিতি করিয়া কবিতা লিখাইয়া, সর্ব্ববিধ উপায়ে সনাতনপুরের অধিবাসীবৃন্দ অনায়াসে তাহাদের উত্তেজনা প্রকাশ করিতে পারিত। কিন্তু তাহাদের বর্ত্তমানে এ-সব কিছুই করিবার উপায় নাই। নিরুপায় হইয়া তাহারা শুধু ফুস্-ফুস্ গুজ-গুজ করিতেছে মাত্র কারণ আর কিছুই নহে, শ্যামা নাম্নী ধোপানিটিও সঙ্গে-সঙ্গে অন্তর্হিতা হইয়াছে।

যাঁহারা প্রবীণ এবং শৈলেশ্বরের হিতৈষী তাঁহারা বাহিরে কথাটাকে সাধ্যমত চাপা দিবার চেষ্টা করিতেছেন। হালদার-মহাশয় সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন, শৈলেশ্বর একটা মোকদ্দমার তদ্বির করিতে খুলনা গিয়াছেন। যাইবার সময় তাঁহার সহিত দেখা হইয়াছিল।

কথাটা সর্ব্বৈব মিথ্যা। প্রবীণ হালদার মহাশয় কিন্তু প্রবলভাবে

উহা প্রচার করিতে লাগিলেন। এই হালদার-মহাশয়ের সহিতই কিন্তু আবার যখন প্রবীণ ভাদুড়ী-মহাশয়ের সাক্ষাৎকার ঘটিল তখন তিনি নিম্নস্বরে বলিলেন, শৈলেশ কি কেলেঙ্কারিটাই করলে। ছি ছি—"

এতৎপ্রসঙ্গে ভাদুড়ী-মহাশয় য-ফলা আকার ব্যবহার করাটাই অধিকতর সমীচীন মনে করিলেন! বলিলেন—"আরে ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা—!"

পরমুহূর্ত্তেই কিন্তু ভাদুড়ী সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, কোন ধোপানিটা বলত হে?"

দেখা গেল, হালদার-মহাশয় বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানেন। তিনি উক্ত রজকিনীর আবাস-স্থান, চেহারা বয়স এবং স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া উপসংহারে বলিলেন, "শৈলেশ যে ভেতরে-ভেতরে এতখানি জড়িয়ে পড়েছে কে জানত?' অত বড় ছেলে অত বড় মেয়ে—"

ভাদুড়ী-মহাশয় আবার বলিলেন, "ছ্যা-ছ্যা! লোক হাসালে!" খোঁড়া মল্লিক-মহাশয় কৌশলে খবর সংগ্রহ করিলেন যে শ্যামা পলাইবার আগের দিন তাহার স্বামী পিরু ধোবার নিকট, মার খাইয়া ছিল। মল্লিক-মহাশয় শৈলেশের হিতাকাঙ্ক্ষী। তিনি পিরু-ধোপাকে বলিলেন, "কথাটা আর কারো কাছে প্রকাশ করিস নি, বুঝলি?"

বিস্মিত পিরু জিজ্ঞাসা করিল, "কোন কথাটা?" মল্লিক-মহাশয় থতমত খাইয়া কোন সদুত্তর দিতে না পারিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে নিজেদের দলের মধ্যে ফিরিয়া গিয়া পিরু-ঘটিত ব্যাপার প্রকাশ করিলেন। করিবামাত্র সকলে মিলিয়া মল্লিককেই বকিতে লাগিলেন! —কেন সে পিরু-ধোপার নিকট গিয়াছিল? এ কি আহাম্মকি!

সুতরাং মল্লিক-মহাশয়ের এই কাঁচা কাজটি সামলাইতে পাকাবুদ্ধি

মুকুজ্জ্যে-মহাশয়কে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পিরুর বাড়ীতে যাইতে হইল এবং নিরীহ মল্লিকের নামে মিথ্যা দোষারোপ করিয়া বলিতে হইল, মল্লিকের কথায় কিছু মনে করিসনি। সিদ্ধির ঝোঁকে যা-তা বলেছে।"

এবারও বিস্মিত পিরু কহিল, "মানে? কি বলেছেন?" মুকুজ্জ্যে দাঁত বাহির করিয়া বলিলেন, "মানে? ও কিছু নয়!—বুঝলি?" বলিয়া তিনি সরিয়া পড়িলেন এবং নিজেদের দলে আসিয়া সংবাদ দিলেন, "পিরু একেবারে ক্ষেপে আছে হে! মল্লিক একেবারে সাপের ঘাড়ে পা দিয়েছে।"

সকলে চটিয়া মল্লিকের উপর খড়্গহস্ত! বেচারি মল্লিক দলছাড়া হইয়া একা একা ঘুরিতে লাগিলেন। পিরুর দল দূর হইতে মল্লিককে যখনই দেখিল, তখনই হাসিল এবং ভাবিল মলিকমহাশয় আজকাল সিদ্ধি খাইতেছেন।

যাই হোক শৈলেশ্বরবাবুর বন্ধুবর্গ—মিত্র, হালদার, মুকুজ্জ্যে প্রভৃতি প্রবীণ মহাশয়গণ একজোট হইয়া একবাক্যে শৈলেশ্বরবাবুর খুলনা-গমন সমর্থন করিতে লাগিলেন। ভিতরে-ভিতরে অবশ্য ভাদুড়ী হইলেন কৌতূহলী, মুকুজ্জ্যে উত্তেজিত, হালদার বিস্মিত এবং মল্লিক ক্ষুব্ধ!

ইহা হইল শৈলেশ্বরের হিতৈষীবর্গের মনোভাব। কিন্তু সনাতনপুর গ্রামটি নেহাৎ ছোট নয়! অনেকগুলি বনিয়াদি ভদ্রগৃহস্থের সেখানে বসবাস। গোটা-দুই চণ্ডীমণ্ডপ সেখানে আছে। সুতরাং শৈলেশ্বর বাবুর বিপক্ষদলও একটি ছিল এবং যেহেতু শৈলেশ্বরবাবু বড়লোক, পরোপকারী, কর্ম্মনিষ্ঠ এবং সত্যবাদী ছিলেন, সেই হেতু তাঁহার বিপক্ষ দলটি বেশ ভারিও ছিল। তাঁহারা সুযোগ পাইলেন। শৈলেশ্বর-রজকিনী-প্রসঙ্গটা তাঁহারা বেশ-একটু রঙ চড়াইয়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

একজন আসিয়া খবর দিল, "হালদার-মশাই বলে বেড়াচ্ছেন যে, শৈলেশ্বরবাবু নাকি খুলনা গেছেন।"

হুঁকাতে দুইটি টান মারিয়া রায়-মহাশয় বলিলেন, "হালদারকে বলে দিও হে—সূর্য্য আজকাল পশ্চিমেই ওঠে—তা আমরা সবাই জানি। খুলনার চেয়ে ঢাকা বললে আরও মানাত।"

মাথা নাড়িয়া মুচকি হাসিয়া লাহিড়ী বলিলেন—"আহা চট কেন! একথা হালদার বলবে না ত কে বলবে বল। ওই দলটার সব কটা পাজী। বুড়ো মিত্তিরটা সেদিন দেখি লুকিয়ে তাড়ি খেয়ে ফিরছে। উনি আবার মাষ্টারি করেন!"

"ভাদুড়ীর বা কি কম! রোজ ওঁর ময়নাদীঘির ধারে বেড়াতে যাওয়াটার অর্থ কি?

বৃদ্ধ গোস্বামী-মহাশয় এতক্ষণ কিছু বলেন নাই।

তিনি এইবার সংক্ষেপে বলিলেন,—"সব ঘুঘু।"

"পাঁড়-ঘুঘুটি এইবার ফাঁদে পড়েছেন!" এই বলিয়া রায়মহাশয় হুঁকাটি গোস্বামীর হস্তে দিলেন।

২

ফলে অচিরকাল মধ্যে শৈলেশ্বরবাবুকে কেন্দ্র করিয়া ভাদুড়ী-মহাশয়ের বিরুদ্ধে রায় মহাশয়, রায়-মহাশয়ের বিরুদ্ধে মুকুজ্জ্যে-মহাশয়, মুকুজ্জ্যে-মহাশয়ের বিরুদ্ধে গাঙ্গুলি-মহাশয় উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া, গেলেন। শৈলেশ্বরবাবুর সম্পর্কে অসম্ভব-রকম সব গুজব রটিতে লাগিল। অধিকাংশ লোকের মতে তিনি কলিকাতায় গিয়াছেন। কিন্তু এই কলিকাতা-সম্পর্কিত মতবাদের বিরুদ্ধে আর একটি জনমত ক্রমশঃ গঠিত হইতেছিল। তাহা এই যে, ট্রেনে করিয়া তিনি কোথাও

যান নাই—কারণ ষ্টেশনের কর্ম্মচারীরা কেহ তাঁহাকে ট্রেনে যাইতে দেখেন নাই। সুতরাং তিনি পদব্রজেই কোথাও গিয়া স-রজকিনী আত্মগোপন করিতেছেন! একজন প্রত্যক্ষদর্শী জোর-গলায় বলিতে লাগিলেন, "আমি স্বচক্ষে দেখেছি, শৈলেশ্বরবাবু ধোপানিটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে মাঠামাঠি দৌড়ুচ্ছেন।"

৩

শৈলেশ্বরবাবুর পত্নী সপুত্রকন্যা পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন। শৈলেশ্বর-বাবুর পলায়নের গুজবটা এত ব্যাপকভাবে রটিয়াছিল যে,ভীত-চকিত শৈলেশ্বর গৃহিণী স্বয়ং একদিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়া কিন্তু তিনি আরও অকূল পাথারে পড়িলেন। তাঁহার সমবয়স্কা গৃহিণীগণ বেশ রসায়ন দিয়া নানা কথা তাঁহাকে শুনাইল।

"ওমা কি ঘেন্নার কথা, শুনে লজ্জায় বাঁচি না—।"বলিয়া অনেকেই গালে হাত দিল এবং ঘাড় কাৎ করিল।

গাঙ্গুলী-গৃহিণী বলিলেন, "পুরুষমানুষকে কিছু বিশ্বাস নেই বোন, কিছু বিশ্বাস নেই। একবার চোখের আড়াল হয়েছে কি বাস্।"

হালদার-গৃহিণী একটু সহানুভূতির সুর দিয়া বলিলেন, "উনিত বলছিলেন শৈলেশবাবু খুলনা গেছেন—"

মুখোপাধ্যায়-গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "থাম লো থাম্। আমার কর্ত্তাটিও ওই দলে। সব চোরে-চোরে মাস্তুতো ভাই। বলে দিয়েছি এবার পষ্ট করে যে ওসব দলে আর মিশতে পাবে না। খাবেদাবে রান্নাঘরের দাওয়াটিতে চুপ করে বসে থাকবে। বুড়ো মিনষের অত আড্ডা দেওয়া কেন?

মুখোপাধ্যায়-গৃহিণীর ফাঁদি-নথ ঘন-ঘন আন্দোলন হইতেলাগিল।

মরীয়া হইয়া শৈলেশ্বরবাবুর স্ত্রী বলিলেন,"কোনদিন কিন্তু ওঁকে শ্যামা ধোপানির সংস্রবে দেখিনি। আমাদের কাপড় ধোয় ছিরু ধোপা। শ্যামা ত কোনদিন আসেও নি আমাদের বাড়ী—"

মুখোপাধ্যায়-গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, "এই বুদ্ধি না হলে তোমার স্বামী যাবে কেন বোন্! তারা যা করবে তা কি তোমাকে সাক্ষী রেখে করবে নাকি? শৈলেশবাবু হলেন একটা ঘাগি মোক্তার। তার সঙ্গে চালাকি। পুরুষমানুষদের বশে রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে—নজরবন্দী করে রাখা। চোখে-চোখে রাখা। যা বল্লেন আমাদের গাঙ্গুলিদিদি, চোখের আড়াল হয়েছে কি বাস্।"

৪

শৈলেশ্বরবাবুর দুই পুত্র মাধব ও যাদব। মাধব, বি, এ, পাস্ করিয়াছে। যাদব আই, এ, পড়িতেছে। তাহারা পূজনীয় পিতার সম্পর্কে এই দুরপনেয় কলঙ্কের কথা শুনিয়া নির্ব্বাক হইয়া গেল। কিন্তু কি করিবে। তাহাদের বন্ধু-বান্ধবের মধ্যেও সকলে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিয়াছিল যে শৈলেশ্বরবাবু প্রকৃতই একটি ঝুনা-ভণ্ড—এতদিনে দিবালোকে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যেও কয়েকজন ছোকরা মাধব ও যাদবের পক্ষ অবলম্বন করিল। এবং মৌখিক সহানুভূতি জানাইতে লাগিল। এদিকে বৃদ্ধদের দুইপক্ষের মধ্যে ব্যাপার অনেকদূর গড়াইয়াছিল। হালদার-মহাশয়ের উপর ধনী রায়-মহাশয় এতদূর চটিয়াছিলেন যে,তিনি তাঁহার নামে ডাব-চুরির অপবাদ দিয়া নালিশ ঠুকিয়া দিয়াছেন। ভাদুড়ী-মহাশয় মাণিক পোদ্দারের নিকট হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া কিছু টাকা লইয়াছিলেন, গাঙ্গুলী মহাশয়ের উস্কানিতে পোদ্দারের পো ভাদুড়ী-মহাশয়কে চাপ দিতে সুরু

করিয়াছে। মল্লিক-মহাশয় হোমিওপ্যাথি ডাক্তারি করেন। তিনি বিপক্ষদলের কাহারো বাড়ী আর চিকিৎসা করিবেন না বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। ফলে গোস্বামী-মহাশয় কলিকাতা হইতে "সরল হোমিওপ্যাথি–শিক্ষা" নামক পুস্তক ক্রয় করিয়া হোমিওপ্যাথি শিখিতে লাগিয়া গিয়াছেন।

শৈলেশ্বরবাবুর নামে দুই-চারি খানি চিঠি আসিয়াছিল। চিঠিগুলি কি করিয়া বিপক্ষদলের হস্তগত হইল। এই ব্যাপারে ক্ষেপিয়া স্বদলের কয়েকজন পাণ্ডা স্থানীয় পোস্টমাস্টারের বিরুদ্ধে এক প্রকাণ্ড দরখাস্ত দিয়া ফেলিলেন।

পোস্টমাস্টার বেচারা এই আকস্মিক বিপদে সকলের দ্বারস্থ হইয়া ব্যাপারটা মিটাইয়া ফেলিবার জন্য সকাতরে অনুরোধ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। গ্রামের উকিল আশুবাবু টেবিল চাপড়াইয়া তাঁহাকে বলিয়া দিলেন—"Everything is fair in love and fight! শেষ পর্য্যন্ত লড়ে দেখব—তবে ছাড়ব!"

৫

সনাতনপুরে ঘোর চাঞ্চল্য। সকলেরই রসনা সবেগে চলিতেছে। এমন সময় গ্রামে দুইটি ঘটনা ঘটিল।

—হঠাৎ শ্যামা ধোপানি কোথা হইতে ফিরিয়া আসিল। সে নাকি মামার বাড়ী গিয়াছিল। দেখা গেল, পিরুর সহিত তাহার কোন কলহ নাই। দুইজনে গাধার পিঠে মোট চাপাইয়া বেশ স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরা করিতে লাগিল—যেন কিছুই হয় নাই। প্রবীণের দল কতকটা হতভম্ব হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তাহার পর অবশ্য তাঁহারা ব্যাপারটা বুঝিয়া ফেলিলেন, "ভূতের কাছে

মামদোবাজী। মামার বাড়ী। পিরু-ব্যাটা টাকা খেয়েছে নিশ্চয়। মাধব ছেলেটা ঘড়েল আছে ত।”

শৈলেশ্বর মোক্তার আর ফিরিলেন না। কারণ তিনি মারা গিয়াছিলেন। প্রেমে পড়িয়া নয়—কূপে পড়িয়া। গ্রামেই একটা অব্যবহৃত এঁদো নেড়া কূয়া ছিল। তাহারই ভিতর হইতে তাঁহার গলিত শবদেহটা কিছুদিন পরে বাহির হইল।

মল্লিক-মহাশয় আবিষ্কার করিলেন।

মাত্র দশটি টাকা

১

অপ্রস্তুত হইয়া বিধুবাবু বলিলেন, “আচ্ছা থাক, তাতে কি হয়েছে? হাতে যখন থাকবে, তখন দেবেন। ব্যস্ত কি?”

ততোধিক অপ্রস্তুত হইয়া নিখিলবাবু বলিলেন, “না, ব্যস্ত হবার কথা বৈ কি! এই নিয়ে আপনাকে তিনবার ঘোরালাম। আজ আপনাকে ঠিক দিতাম, কাল রাত্রে টাকাটা এনেও রেখেছিলাম। কিন্তু সকালে বোসজা-মশাই এসে একেবারে নাছোড় হয়ে পড়লেন। বেনারসে তাঁর ছেলের অসুখ করেছে—তার এসেছে—কিছু টাকা না হলে—”

বিধুবাবু বলিলেন, “তা বেশ করেছেন দিয়েছেন! তার জন্যে আর কি হয়েছে! তিনি ফেরৎ দিলে আমাকে দেবেন এখন। আজ দেখি যদি বিপিন কিছু ধার দেয়। আমারও আজ দরকার কিছু টাকার—” বলিয়া বিধুবাবু উঠিলেন। বিধুবাবু বাহির হইয়া যাইতেই

নিখিলবাবুর অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়া গেল এবং মনে মনে তিনি বলিলেন, "চামার কোথাকার! ক'টা টাকার জন্যে আর ঘুম হচ্ছে না।"

বাহিরে গিয়া বিধুবাবুরও মুখভাব বদলাইল এবং তিনিও অনুচ্চস্বরে বলিলেন, "বেটাচ্ছেলে ভোগাবে দেখছি।"

২

স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে দিন কাটিতে থাকে। একটি সপ্তাহ কাটিল। বিধুবাবু আবার একদা প্রাতে নিখিলবাবুর বাহিরের ঘরটিতে আসিয়া দেখা দিলেন। প্রায় মাস তিনেক পূর্ব্বে বিধুবাবু নগদ দশটি টাকা নিখিলবাবুকে ধার দিয়াছিলেন, এবং "কালই সকালে দিয়ে দেব" এই প্রতিশ্রুতি পাইয়াছিলেন, কিন্তু নিয়তির এমনই পরিহাস যে, আপিসের গণ্যমান্য বড়বাবু নিখিলনাথ মিত্রকে অদ্যাপি অধমর্ণই থাকিতে হইয়াছে—তাহাও সামান্য দশটি টাকার জন্য এবং বিধুচরণ বসুর মত একটা লোফারের নিকট! "হায়রে নিয়তি—তোমাকে গড় করি। নলরাজার মত বিচক্ষণ রাজাকেও তুমি নাকাল করিয়াছিলে, আমিতো সামান্য কেরানি মাত্র—"ইহাই ছিল নিখিলনাথের সান্ত্বনা। বাল্যকালে নিখিলনাথ মহাভারতের গল্প শুনিতে ভালবাসিতেন, এইরূপ জনশ্রুতি আছে।

বিধুচরণ আসিতেই নিখিলনাথ মুখে এমন একটা ভাবপ্রকাশ করিলেন, যেন তিনি বিধুচরণের পথ চাহিয়াই উৎকণ্ঠিত ভাবে দিনযাপন করিতেছিলেন। বিধুচরণ আসাতে তাঁহার সে দারুণ উৎকণ্ঠা বিদূরিত হইল।

"বাঁচা গেল! আসুন বিধুবাবু, আপনার কথা রোজই ভাবি; আজ আমাদের পাড়ায় গণেশ-অপেরা যাত্রা হবে! আসবেন শুনতে?

একজন মনোমত সঙ্গী না পেলে এসব জিনিস শুনে সুখ নেই! আসুন না।”

যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াছেন, বিধুচরণের মুখমণ্ডলে এইরূপ একটি আনন্দ-জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইল। তিনি উদ্ভাসিতচক্ষু তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “হ্যাঁ হ্যাঁ, বেশত! কটার সময়—”

“আটটা! সন্ধ্যে আটটা—”

“আসব শুনতে।”

এমন সময় নিখিলনাথবাবুর ছয়বৎসরের কন্যা মিণ্টু আসিয়া বলিল, “বাবা, মা বললে চিনি ফুরিয়ে গেছে।” বিধুবাবু মিণ্টুকে ধরিয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। এত আলাপ তিনি নিজের মেয়ের সহিতও করেন না।

“বাঃ খুকী তোমার ফ্রকটি তো বেশ সুন্দর! মাথার ফিতেও চমৎকার দেখছি তো!”—ইত্যাকার নানারূপ আলোচনায় আরও মিনিট দশেক কাটিল।

বিধুচরণবাবুর এখানে আসার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দশটি টাকা। কিন্তু মুখ ফুটিয়া তাগাদা করিতে পারিলেন না। নানা ছুতানাতায় কালহরণ করিতে লাগিলেন, যদি নিখিলনাথবাবু কথাটা নিজেই পাড়েন। বিধুচরণবাবুর চক্ষুলজ্জা প্রবল।

নিখিলনাথবাবুর মহাভারতীয় মন। তিনি ও-দিক দিয়াই গেলেন না। এ বৎসর ফতেপুর সিক্রিতে কি ভীষণ শীত পড়িয়াছে, এবং তজ্জন্য গরীব লোকদের কি দারুণ কষ্ট হইতেছে, এই সম্পর্কে তিনি নানাভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া নয়টা বাজিল। নিখিলনাথবাবু বলিলেন, “এইবার আপিস যাওয়ার যোগাড় করা যাক।”

বিধুচরণ এইবার মরীয়া হইয়া বলিয়া ফেলিলেন,"বোস্‌জা মশায়ের কাছে টাকাটা ফেরত পেয়েছেন না কি ?" নিখিলনাথ যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, "ঠিক ঠিক ভুলেই গেছি তো। টাকা আপনার জন্যে রেখেছি আমি—" বলিয়া তিনি পকেট হাতড়াইতে লাগিলেন।

"আরে গেল যা! চাবিটা ফেললাম কোথা!" সমস্ত পকেটগুলি খুঁজিলেন। টেবিলের নীচে, আলমারীর মাথায় সর্ব্বত্র খুঁজিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্য, চাবি পাওয়া গেল না। বিধুচরণও খুঁজিলেন এবং শেষটা বলিলেন, "আচ্ছা থাক—ব্যস্ত কি—"

৩

সন্ধ্যাকালে যথাসময়ে আসিয়া বিধুবাবু দেখিলেন, নিখিলনাথ অনুপস্থিত! খোঁজ করিয়া জানিলেন যে, কোন প্রয়োজনীয় কার্য্যে তিনি বাহিরে গিয়াছেন কখন ফিরিবেন স্থিরতা নাই। বিধুচরণ একাই বসিয়া যাত্রা শুনিলেন। উত্তরার অভিনয় তাঁহার বেশ ভাল লাগিল! শরীরের সহিত মনের যে নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না! প্রমাণও মিলিল। উত্তরার দুঃখে তিনি খুব বেশী অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। পরদিন সকালে উঠিয়া দেখিলেন হৃদয়ের বেদনা গলদেশ আশ্রয় করিয়াছে। ঢোঁক গিলিতে কষ্ট হইতেছে এবং টন্‌সিল দুইটি ফুলিয়াছে। এমন কি টেম্পারেচার লইয়া দেখিলেন, সামান্য জ্বরও হইয়াছে। সামান্য জ্বর ক্রমশঃ অসামান্য হইয়া উঠিল। তখন শয্যাগত বিধুচরণ চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, নিখিলনাথের সঙ্গে দেখা না হইলে তিনি কদাপি যাত্রা শুনিতে যাইতেন না, এবং ইহাও সত্যকথা যে, মূলে দশটি টাকা না থাকিলে কেবলমাত্র সঙ্গকামনায় নিখিল নাথের সহিত তিনি দেখাও করিতে যাইতেন না। এইরূপ বিশ্লেষণ

করিবার পরে বিধুচরণ বলিতে বাধ্য হইলেন, "ব্যাটা আমাকে ধনে প্রাণে মারবে দেখছি!"

বিধুচরণ একসপ্তাহ শয্যাশায়ী থাকিলেন এবং চিকিৎসা বাবদ তাঁহার ১৭৸/১৫ খরচ হইল।

৪

উক্ত ঘটনার পর একটি মাস কাটিয়াছে। কারণ পৃথিবী বাঙালী নহে, নিয়মিতভাবে সে নিজকক্ষে ঘুরিয়া চলিয়াছে, নিয়মিতভাবে দিবারাত্রি আসিতেছে এবং যাইতেছে।

সে দিন মাসের ছয় তারিখ। নিখিলনাথ নীচের ঘরটাতে বসিয়া মানসাঙ্ক কষিতেছিলেন। আগামীকল্য তিনি মাহিনা পাইবেন। কাটিয়া-কুটিয়া ৫৫।৶১০। ইহার মধ্যে বাড়ীভাড়া দিতে হইবে ১৫৲, মুদীকে দিতে হইবে ২০৲। বাকী থাকে ২০।৶১০! সাড়ে সাত আনা ছাড়িয়া দিলে—থাকে কুড়ি টাকা। ইহার ভিতর সমস্ত মাসের তরকারি খরচ, ছেলেমেয়ের স্কুলের মাহিনা, দুধ, কেরোসিন তেল, কাপড়-চোপড়ের বিল! নাঃ, বিধুচরণ বাবুকে দশটা টাকা দেওয়া অসম্ভব।

গৃহিণীর হাতে অবশ্য গোটাকয়েক টাকা আছে। বাজার খরচ প্রভৃতি হইতে এক-আধ পয়সা করিয়া বাঁচাইয়া নিখিল-গৃহিণী গোটা কয়েক টাকা জমাইয়াছেন ঠিকই কিন্তু ঠিক কয়টা টাকা তাহা নিখিলের সঠিক জানা নাই; তাহা ছাড়া এই কয়টি টাকা হইতে শোভাকে বঞ্চিত করিতে নিখিলনাথের মায়া হয়। কি বলিয়া চাহিবে!

বিধুর কাছে সে টাকাটা লইয়াছিল, রেস্ খেলিবার জন্য। বলা বাহুল্য, হারিয়াছে। একথা অকপটে স্ত্রীর নিকট প্রকাশ করিয়া

বলিবার মত নহে। নিখিলনাথ ভাবিয়াছিল, কোনরূপে ম্যানেজ করিয়া টাকাটা সে বিধুকে দিয়া দিবে। কিন্তু প্রতিমাসেই সে একবার করিয়া মানসাঙ্ক কষিয়া দেখিতেছে, ম্যানেজ করা অসম্ভব। অথচ মিথ্যা অজুহাত দেখাইয়া বিধুকে আর ঠেকাইয়া রাখাও অসম্ভব। প্রত্যেক জিনিষেরই একটা সীমা আছে। নিখিলনাথ কি করিবে ভাবিতেছিল এমন সময় গলির মোড় হইতে হঠাৎ বিধুর কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল, "এই একবার নিখিলবাবুর কাছে যাচ্ছি!"

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় নিখিলনাথ তাড়াতাড়ি উঠিয়া পাশেই একটা চোরকুঠুরি ছিল তাহাতে ঢুকিয়া খিল লাগাইয়া দিলেন।

৫

"নিখিলবাবু!"

মিণ্টু আসিয়া কহিল, "বাবা তো এক্ষুনি এখানে বসেছিলেন। বাইরে গেছেন তাহলে।"

"আচ্ছা। এলে বোলো যে আমি এসেছিলাম।"

"আচ্ছা।"

বিধুবাবু চলিয়া গেলেন। বিধুবাবু চলিয়া যাইতে না যাইতে "বাপরে বাপ—উঃ উঃ—" করিতে করিতে সবেগে নিখিলনাথ চোরকুঠুরি হইতে বাহির হইলেন। চোর-কুঠুরির কোণে একটা বোলতার চাক ছিল। কামড়ের চোটে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া নিখিলবাবু গাড়ু হইতে খানিকটা জল লইয়া চোখে মুখে ঝাপ্টা দিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে বাঁ চোখটা ফুলিয়া চোখ ঢাকিয়া গেল এবং ডান দিকের গালটার স্ফীতি মিণ্টুর হাস্যোদ্রেক করিল। নিখিলনাথ উপরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন।

ঠিক এমনি সময় দুইজন লোক ধরাধরি করিয়া বিধুবাবুকে লইয়া হাজির! কি করিয়া নিখিলনাথের কাছে টাকাটা আদায় করা যায় তাহাই ভাবিতে ভাবিতে তিনি এমন অন্যমনস্কভাবে পথ চলিতেছিলেন যে কলার খোসায় পিছলাইয়া একেবারে সাংঘাতিক রকম পড়িয়া গিয়াছেন। মাথা কাটিয়াছে, হাতও ভাঙিয়াছে। দুইজন পথিকের সহায়তায় অতিকষ্টে তিনি নিখিলনাথের বাড়ী ফিরিয়াছেন। তাঁহার বাড়ী অনেক দূর।

নিখিলনাথ উপরে গিয়া বিছানায় শুইয়াছিলেন। ডাকাডাকিতে নামিয়া আসিয়া দক্ষিণ চক্ষুটি দিয়া দেখিলেন বিধুচরণ আবার ফিরিয়াছে।

উভয়ে উভয়কে দেখিয়া যুগপৎ বলিয়া উঠিলেন, "বাঁচান আমাকে।"

* * * *

আরও তিনমাস কাটিয়াছে।

নিখিলনাথ এখনও টাকা দেন নাই।

বিধুচরণ এখনও ঘোরাফেরা করিতেছেন।

শেষ রক্ষা

সুপ্রসিদ্ধ গল্পলেখক অম্বুজাক্ষ ভৌমিক অতিশয় চিন্তাগ্রস্ত। বর্ত্তমান বাজারে লেখক মাত্রেই একটু বিপন্ন। ভাল লেখার সমঝ্‌দার নাই, ভাল লেখার বাজার দর কম এবং ভাল লেখাকে ক্ষত বিক্ষত করিবার জন্য একদল সমালোচক সর্ব্বদাই সশস্ত্র হইয়া আছেন। ভৌমিক মহাশয়ের বর্ত্তমান চিন্তার কারণ কিন্তু স্বতন্ত্র। তিনি গত পরশ্ব হইতে একটি গল্প সুরু করিয়াছেন—খুব মনোরম ভাবেই সুরু করিয়াছেন—(লিখিতে লিখিতে নিজেরই তাঁহার বার কয়েক রোমাঞ্চ হইয়াছে)—কিন্তু কি করিয়া এই বিস্ময়কর উপাখ্যানটি তিনি শেষ করিবেন তাহা তাঁহার মাথায় কিছুতেই আসিতেছে না। গল্পের শেষ রক্ষা করা সত্যই একটি দুরূহ সমস্যা—গল্পলেখক মাত্রেরই তাহা জানা আছে। শেষ বরাবর আসিয়া ভৌমিক মহাশয় লেখনী সম্বরণ করিয়া বসিয়া আছেন। সকাল হইতে চার পেয়ালা কড়া চা এবং এক প্যাকেট সিগারেট্ শেষ হইয়া গিয়াছে—গল্প কিন্তু শেষ হইতে চাহে না।

ভৌমিক মহাশয় বসিয়া আছেন—নির্জ্জন ত্রিতলের ঘরটিতে। ঘরের কপাটটি খোলা! মুক্ত দ্বারপথ দিয়া কিঞ্চিৎ বাতাস, স্ত্রীর কণ্ঠস্বর, ছেলেমেয়েদের হুড়োমুড়ির শব্দ এবং দুইটি বায়সের চীৎকারধ্বনি প্রবেশ করিতেছিল। বাতাসটা মন্দ লাগিতেছিল না—কিন্তু উপরোক্ত শব্দগুলির প্রত্যেকটিই যেন গল্পের প্লটটিকে গলাধাক্কা দিয়া মস্তিষ্ক হইতে বিদূরিত করিয়া দিতেছে—ভৌমিক মহাশয়ের এইরূপ মনে হইল। তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দ্বারদেশ অর্গলবদ্ধ করিলেন এবং একটি ভীমকান্তি সিগার ধরাইয়া হাঁটু নাচাইতে লাগিলেন। এই ভাবে কিছুক্ষণ

কাটিল। জানু যুগল পরিশ্রান্ত হইল—কিন্তু গল্পের কোন সুরাহা হইল না। ভৌমিক মহাশয় তখন ক্লান্ত হাঁটুকে আর না ঘাঁটাইয়া দক্ষিণ কর্ণটি লইয়া পড়িলেন। একটি দিয়াশালাই কাঠি সন্তর্পণে তিনি দক্ষিণ কর্ণ-বিবরে প্রবেশ করাইয়া দক্ষিণ চক্ষু ও গণ্ডদেশ কুঞ্চিত করিলেন। গল্পের শেষটা আজ লিখিয়া দিতেই হইবে—কারণ গল্প দেওয়ার আজই শেষ দিন। আজ গল্পটি দিতে না পারিলে "চমৎকারিণী নামক মাসিক পত্রিকায় তাহার স্থান এ মাসে অন্ততঃ হইবে না। এ মাসে না হইলে পঁচিশটি টাকা ত মারা যাইবেই—উপরন্তু তিনি গৃহিণী এবং সম্পাদক উভয়েরই নিকট খেলো হইয়া যাইবেন।

সম্পাদককে কথা দিয়াছেন যে, একটি বৃহৎ চমকপ্রদ গল্প তিনি পঁচিশ টাকা পাইলে লিখিয়া দিবেন এবং তৎপূর্ব্বে,তিনি গৃহিণীর নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে আগামী মাসে তিনি তাঁহাকে পঁচিশ টাকা দিয়া একখানি মুগার শাড়ী খরিদ করিয়া দিবেনই দিবেন। দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণীকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে বৈ কি!

গৃহিণীকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে বলিয়াই তিনি "চমৎকারিণী" পত্রিকায় আদৌ লিখিতে রাজী হইয়াছেন। তাহা না হইলে তিনি ওরূপ তৃতীয় শ্রেণীর কাগজে উত্তেজক গল্প লিখিতে রাজী হইতেন কি? অম্বুজাক্ষ ভৌমিক একজন নামজাদা রক্ষণশীল লেখক। চিরকাল তিনি তাঁহার প্রত্যেকটি গল্পে পুণ্যের জয় ও পাপের ক্ষয় দেখাইয়া আসিয়াছে এবং এই ধরণের গল্প ভৌমিক মহাশয়ের হাতে খোলেও ভাল। তাঁহার লিখিত "হিন্দু বৈজয়ন্তী" গ্রন্থের পাতায় পাতায় উপদেশ। গল্পচ্ছলে নীতিকথা প্রকাশ করিতে তিনি অদ্বিতীয়! তাঁহার 'বঙ্গ বিষাণ' নামক গ্রন্থটি প্রত্যেক যুবক-যুবতী, শুধু যুবক-যুবতী কেন, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই পড়িয়া দেখা উচিত। এ হেন ভৌমিক মহাশয় প্রৌঢ়ত্বের

শেষ সীমায় উপনীত হইয়া কেবল গৃহিণীর মনোরঞ্জনার্থেই এক ছ্যাবলা কাগজের সম্পাদকের ফরমায়েস অনুযায়ী এই ফ্যাসাদে পড়িয়াছেন। নীতিমূলক তাঁহার একটি সুন্দর গল্প ছিল। কেমন করিয়া বিলাসপুরের ধর্ম্মাত্মা জমিদার একটি অজ্ঞাতকুলশীলা রমণীর সতীত্ব রক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পথে দাঁড়াইলেন—কেমন করিয়া দুরাত্মা ধনী মাধবলাল বজ্রাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইল এবং কেমন করিয়া আবার সেই সর্ব্বস্বান্ত জমিদার কেবলমাত্র পুণ্যফলে এক সন্ন্যাসীর সহায়তায় হস্তচ্যুত জমিদারী পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলেন—এই সমস্তই সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি তাঁহার "সতীর আশীর্ব্বাদ" নামক গল্পটিতে লিখিয়াছিলেন। কিন্তু "চমৎকারিণী"র সম্পাদক মহাশয় মাইনাস্ থ্রী চশমা পরিধান করিয়া সম্ভবতঃ কন্টিনেণ্টাল ভাব-রাজ্যের অলি-গলিতে ঘুরিয়া বেড়ান—তিনি উক্ত গল্পটি পছন্দ করেন নাই। কি ধরণের গল্প হইলে তাঁহার পছন্দ হইতে পারে তাহারও আভাস দিয়াছেন। তরুণী গৃহিণীর অভিমানভরা মিষ্ট মুখখানির খাতিরে "যা থাকে কপালে" বলিয়া পরশু দিন হইতে ভৌমিক মহাশয় কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া পড়িয়াছেন। বদ্ধপরিকর হইয়াও বিশেষ কিছু সুবিধা হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে না। শেষ-পর্য্যন্ত কানে দিয়াশালাই কাঠিও ঢুকাইতে হইয়াছে।

২

"উঃ" বলিয়া কাঠিটি ভৌমিক মহাশয় কান হইতে বাহির করিলেন। বাতায়ন-পথে চাহিয়া দেখিলেন খোলার বাড়ীর চালে বসিয়া একটি বীর হনুমান দাঁত খিঁচাইতেছে এবং একটি বৃদ্ধা তদ্দর্শনে নিজের বড়িগুলি সামলাইতেছেন। ভৌমিক মহাশয় যে গল্প ফাঁদিয়াছেন এই সব অকিঞ্চিৎকর দৃশ্য তাহাতে কাজে লাগিবে না ভাবিয়া তিনি চক্ষু

অন্যদিকে ফিরাইলেন। অন্য দিকে মানে ঘরের দেওয়ালের দিকে! কিন্তু ভৌমিক মহাশয়ের ভাড়াটে গৃহের দেওয়ালেও এমন কোন কিছু ছিল না যাহা তাঁহার "প্রেমের জন্য" নামক গল্পের শেষরক্ষা করিতে পারে। নিরুপায় হইয়া ভৌমিক চক্ষু মুদিয়া চুরুটে একটি টান দিলেন! টান দিয়াই বুঝিলেন চক্ষু খুলিতে হইবে। চুরুট নিবিয়াছে, ধরান দরকার। নিপুণভাবে চুরুটটি তিনি ধরাইলেন। ধরাইয়া ভাবিতে লাগিলেন এ অবস্থায় কি করা উচিত। নায়ক নায়িকার বাড়ী পাঁচিল ডিঙাইয়াছে। অমাবস্যার দ্বিপ্রহর রাত্রি। টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে। নায়ক গুঁড়ি মারিয়া আসিয়া একটি পেয়ারা গাছের তলায় আশ্রয় লইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু সম্মুখে একটি গরু থাকাতে আর অধিকদূর অগ্রসর হইবার সাহস হইতেছে না।

ভৌমিক মহাশয় এই পর্য্যন্ত অবলীলাক্রমে লিখিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু ইহার পর আর কি লিখিলে আর্ট বজায় থাকিবে, নায়ক আর কোন্ কোন্ দুরূহ প্রক্রিয়া করিলে তাহা সম্পাদকের মনোহরণ করিতে পারিবে তাহা ভৌমিক মহাশয়ের মাথায় কিছুতেই আসিতেছে না। তিনি চিরকাল পুণ্যের জয় ও পাপের পতন চিত্রিত করিয়া আসিয়াছেন —এই অশ্লীলমনা নায়ককে লইয়া এখন কি করা কর্ত্তব্য তাহা তিনি ভাবিয়াই পাইতেছেন না। ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার ইচ্ছা করিতেছে 'বেল্লিককে' চাবকাইয়া উহার পিঠের ছাল ছাড়াইয়া ফেলি! কিন্তু তাহাতে আর্ট ক্ষুণ্ণ হইবে এবং আর্ট ক্ষুণ্ণ হইলেই পঁচিশটি টাকা!

উঃ ভগবান্ এ কি সমস্যা! তখন তিনি প্রাণপণে ভগবানকেই ডাকিতে লাগিলেন—"ঈশ্বর এ উভয়-সঙ্কট হইতে আমাকে বাঁচাও! পাপের চিত্র আমি আঁকিতে পারিব না—অথচ গৃহিণীকেও চটাইতে পারিব না। দয়াময়, দয়া কর!"

ভগবান যেন স্বকর্ণে শুনিলেন।

দুই মিনিটে সব ঠিক হইয়া গেল।

ভূমিকম্প হইয়া যাইবার পর সূক্ষ্মকলেবর ভৌমিক মহাশয় আবিষ্কার করিলেন যে, তাঁহার গৃহিণীর আর মুগার শাড়ীর দরকার নাই।

কারণ তিনি বিধবা হইয়াছেন!

যুগ স্বপ্ন

১

সুধীর আসিয়াছে। তাহার হাতে একটা ফুল-সুদ্ধ রজনীগন্ধার ডাঁটা। চোখে মুখে হাসি। তাহার সমস্ত মন যেন পাখা মেলিয়া উড়িতে চাহিতেছে।

সুধীর আসিয়াই বলিল—"হাসি, আজ একটা ভারি সুখবর আছে। কি দেবে বল—তা না হলে বলব না।"

হাসি বলিল—"বলুন না কি!"

"কি দেবে বল আমাকে—"

"কি আর দিতে পারি আমি?—আচ্ছা, আপনার রুমালে একটা বেশ সুন্দর এম্‌ব্রয়ডারী করে দেব। চমৎকার প্যাটার্ণ পেয়েছি একটা।"

"না, ওতে আমি রাজি নই।"

"তবে কি চাই আপনার? চকোলেট আছে দিতে পারি।"

"আমি কি কচি খোকা নাকি? চকোলেটে তুষ্ট হব!"

হাসি হাসিয়া ফেলিল। বলিল—"তা'হলে শুন্‌তে চাই না যান।

এমব্রয়ডারী করে দেব বললাম, চকোলেট দিতে চাইলাম—তাতে যখন আপনার—”

সুধীর বলিল—“চললাম তাহলে !”

হাসি আবার ডাকিল—“বল্‌বেন না কিছুতে ?”

“একটি জিনিস পেলে বলতে পারি। সেই যে সেদিন যা চেয়ে-ছিলাম”—বলিয়া সে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে হাসির পানে চাহিয়া হাসিল।

হাসি হঠাৎ লজ্জা পাইয়া সামলাইয়া লইল।

বলিল—“আপনাকে বলেছি—তা হয় না।”

কিন্তু সুধীরের মুখের দিকে চাহিয়া সে ভয় পাইল। সে শুনিল সুধীর বলিতেছে—“মনে করেছিলাম খবরটা খুব লঘু হাস্য-পরিহাসের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করব। কিন্তু পারলাম না। মাপ কোরো আমায়। শুনে এলাম তোমার বিয়ে সাঁতরাগাছিতে সেই পাত্রটির সঙ্গে ঠিক হোয়ে গেছে।”

বলিয়া সুধীর চলিয়া গেল।

হাসি ডাকিল—“সুধীর দা—শুনে যান।”

সুধীর ফিরিয়া আসে নাই।

২

অলকা আসিয়াছে।

সেই অলকা, যাহাকে একবার দেখিবার জন্য অজয় সমস্ত দিন অপেক্ষা করিত—কখন সন্ধ্যাবেলায় সে আসিবে।

অলকা আসিয়া বলিতেছে—‘আচ্ছা, অজয়দা—ইংরিজিতে ‘পেট’ বলে কোন কথা আছে নাকি ?”

অজয় বলিল—হ্যাঁ আছে, ‘পেট’ মানে মাথা।”

"সত্যি ?"

"অভিধান খুলে দেখ। পেট মানে মাথা !"

"আমাদের বরুণাদি তাহলে ঠিক বলেছেন ত !"

অজয় বলিল—"আচ্ছা, মুণ্ডুর ইংরিজি কি বল ত ?"

অলকা মিটি মিটি তাকাইয়া বলিল—"হেড !"

"হেড মানে ত 'মাথা'"—

"মুণ্ডু মানেও ত মাথা—"

অজয় হাসিয়া বলিল—"এই বুঝি তোমার বাংলা ভাষায় জ্ঞান ! "মাথা আর মুণ্ডু বুঝি একই বস্তু !"

অলকা হাসিয়া বলিল—"তফাৎ কি ?"

অজয় গম্ভীর ভাবে বলিল—"তোমার সঙ্গে আর ওই পাঁচি ধোপানিটার সঙ্গে কোন তফাৎ নেই তাহলে বল ! দুজনেই ত মেয়ে মানুষ !"

অলকা জিজ্ঞাসা করিল—"পাঁচি ধোপানিটী কে ?"

"ওই যে তোমাদের গলিটার মোড়ে একজন ধোপার মেয়ে আছে। কম বয়স—তোমার বয়সী হবে !"

অলকা বক্র হাসি হাসিয়া কহিল—"আজকাল অজয়দা দেখছি সমস্ত জিনিসই বেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখতে আরম্ভ করেছেন ! ধোপানী পর্য্যন্ত বাদ পড়ে না।"

অজয় বলিল—নিশ্চয় ! নিজের জিনিসটি যে ভাল, সেটা যাচাই করে দেখে নিতে হবে না ?"

"কে আপনার নিজের জিনিস।"

"আছে একজন—"

অলকা হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া পাশের টেবিলটা গুছাইতে লাগিল।

অজয় জানালা দিয়া অকারণে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

*　　*　　*　　*

দুইটী স্বপ্ন দুইজনে দেখিতেছে!

অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে দুইজন পাশাপাশি শুইয়া আছে।

হাসির হাতখানা অজয়ের বুকের উপর।

হাসি ও অজয়—স্বামী স্ত্রী।

ভিতর ও বাহির

আমাদের মন সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ বাহিরের—অন্য ভাগ ভিতরের। মনের যেদিকটা বাহিরের তাহা ভদ্র, তাহা সামাজিক এবং সভ্য। ভিতরের মনটা কিন্তু সব সময়ে সভ্য ও সামাজিক নয়—তাহার চাল-চলন চিন্তা-প্রণালী বিচিত্র। বাহিরের মনের কার্য্যকলাপ দেখিয়া ভিতরের মন কখনও হাসে, কখনও কাঁদে এবং ক্বচিৎ সায় দেয়। দুই ভাগের কলহও নিত্যনৈমিত্তিক।

রামকিশোরবাবুর ভিতরের মনটা বহুকালাবধি মৃতপ্রায়। বাহিরের মনের অত্যাচারে সেটাকে জরজর করিয়া ফেলিয়াছিল। রামকিশোর-বাবু উকীল। খুনীকে বাঁচাইবার জন্য মিথ্যা-সাক্ষী সৃষ্টি করিবার প্রয়াস, বড়লোক জমিদারের হইয়া গরীব প্রজার সর্ব্বনাশসাধন, জাল উইল সৃষ্টির পরামর্শদান ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার কার্য্যেই তিনিই বাহিরের ব্যবহারিক মনটার সাহায্য লইয়াছিলেন। ভিতরের মনটা প্রথম প্রথম তীব্র প্রতিবাদ করিয়া অনেক অনর্থ সৃষ্টি করিয়াছিল—আজকাল আর সে কিছু করে না।

সেদিন সকালে রামকিশোরবাবু তাঁহার কেশবিরল মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বাগানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। এক জন বিধবার

সম্পত্তিঘটিত একটা মামলায় তাঁহাকে কিছুকাল যাবৎ বিব্রত করিতেছে। আজ কেসটা কোর্টে উঠিবে—সেজন্য তিনি একটু উদ্বিগ্ন, অন্যমনস্ক আছেন।

এমন সময় আর এক জন প্রৌঢ়গোছের ভদ্রলোক আসিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন যে, তিনি কোন বিষয়ের পরামর্শ লইতে চাহেন। রামকিশোরবাবু ভদ্রলোককে চিনিতেন না। সুতরাং অসঙ্কোচে বলিলেন, "আইন-সংক্রান্ত কোন পরামর্শ দিতে হ'লে আমি 'ফী' নিয়ে থাকি তা জানেন ত?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—কত দিতে হবে আপনাকে?"

"বত্রিশ টাকা।"

"আচ্ছা, বেশ—।"

উভয়ে বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন।

আগন্তুক বলিলেন, "আমার একজন আত্মীয় আছেন—তাঁর একমাত্র ছেলের বিবাহ হয়েছে আজ প্রায় দশ বৎসর। সন্তানাদি আজও কিছু হয় নি। সম্ভাবনাও কম।"

"ডাক্তার দেখিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ, তাঁদেরও মত যে ছেলেপিলে হওয়া শক্ত।"

"ছেলেটি বেশ স্বাস্থ্যবান ত?"

হ্যাঁ, ছেলের কোন রোগ নেই।"

"আমার কাছে কোন্ বিষয়ে পরামর্শ চান" বলিয়া রামকিশোর বাবু একটি নস্যদানি হইতে এক টিপ্ নস্য গ্রহণ করিলেন।

"এ সম্বন্ধে আপনার কাছে শুধু এইটুকু জান্‌তে আসা যে, যদি বংশ লোপই পায়, তাহ'লে শেষ-পর্য্যন্ত সম্পত্তিটা কারা পাবে?"

নস্যের টিপ্‌টা নাসারন্ধ্রে টানিয়া লইয়া রামকিশোরবাবু বলিলেন,

"ছেলে যখন স্বাস্থ্যবান, তখন সে আবার স্বচ্ছন্দে বিয়ে করতে পারে। হিন্দু ল' অনুসারে তাতে কোন বাধা নেই।"

"তা ত নেই! কিন্তু আইনের বাধা না থাক্‌লেও সবসময় কি সব-জিনিস করা সম্ভব?"

রামকিশোরবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "সেন্টিমেণ্ট অনুসারে চললে কি আর দুনিয়ায় চলা যায় মশাই! ওই সব বাজে সেন্টিমেণ্ট নিয়েই ত আমরা ডুব্‌তে বসেছি!"

রামকিশোরবাবু সেন্টিমেণ্টের অপকারিতা সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ একটি বক্তৃতা দিলেন। বাহিরের মন তাঁহার যুক্তি ও কথা জোগাইল। ভিতরের মন নির্ব্বাক।

আগন্তুক তখন বলিলেন, "ধরুন যদি ওঁরা ছেলের বিয়ে আর না দেন তা'হলে সম্পত্তি কারা পাবে?"

আইন-অনুযায়ী যাহারা যাহারা উত্তরাধিকারী হইতে পারে— রামকিশোরবাবু তাহা গড়গড় করিয়া বলিয়া গেলেন।

পরিশেষে তাঁহার স্বকীয় মতটা পুনরায় তিনি বলিতে ছাড়িলেন না;—"ছেলের আবার বিয়ে দিন মশাই। বাঁজা বউ নিয়ে সংসারে সুখ হয় কি? ছেলেপিলে না থাকলে সংসার ত শ্মশান! আমি মশাই যেটা উচিত মনে করছি, তাই আপনাদের বল্‌লাম—আপনার সেন্টিমেণ্টে যদি আঘাত লেগে থাকে মাপ করবেন।"

আগন্তুক বলিলেন, "না না—কিছুমাত্র না। আপনি স্পষ্টবাদী লোক এবং মক্কেলের ঠিক সত্যিকার হিতৈষী—এই শুনেছি বলেই ত আপনার কাছে আসা!"

বত্রিশ টাকা ফী দিয়া ভদ্রলোক বিদায় লইলেন।

চার-পাঁচদিন পরে একদিন একটি গাড়ী আসিয়া রামকিশোরবাবুর

বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল। গাড়ী হইতে একটি অল্পবয়সী স্ত্রীলোক নামিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।

রামকিশোরবাবু বিপত্নীক। বাড়ীতে ঠাকুর-চাকরের সংসার। দ্বিপ্রহরে বিশেষ কেহ নাই—একটা ছোঁড়া চাকর মাত্র আছে। রামকিশোরবাবু কোর্টে। ছোঁড়া চাকরটা ট্রাঙ্ক বিছানা প্রভৃতি নামাইয়া ভিতরে লইয়া গেল। ট্রাঙ্কের উপর নাম লেখা—"সরোজিনী দেবী।"

ব্যবহারে বোঝা গেল, ছোঁড়া-চাকরটা সরোজিনী দেবীকে চেনে না। তা ছাড়া তরুণীটির ব্যবহারে সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

সরোজিনী ভিতরে বারান্দায় গিয়া বাক্স-বিছানা রাখিয়া চাকরটাকে একবার জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু কোথায়?"

"কাছারীতে।"

"কখন আসবেন?"

"জানি না।"

তিনি বারান্দায় নিজের বাক্সটার উপর বসিয়া রহিলেন। বিষাদের প্রতিমা।

* * *

রামকিশোরবাবু কোর্ট হইতে ফিরিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন, "এ কি সরি, তুই হঠাৎ খবর না দিয়ে এলি যে!"

"ও বাড়ীতে থাকা আর পোষাবে না!"

"কেন? ব্যাপার কি?"

রামকিশোরবাবু কন্যার ব্যবহারে ক্রমশই বিস্মিত হইতেছিলেন।

"পোষাবে না, মানে?"

"ওরা ছেলের আবার বিয়ে দিচ্ছে। তুমিও ত মত দিয়েছ!"

"আমি মত দিয়েছি,—মানে ?—"

"ওরা এক জন অচেনা লোক তোমার কাছে পাঠিয়ে তোমার ঠিক মতটা জেনে নিয়ে গেছে। তুমি নাকি বলেছ—ছেলের বিয়ে দেওয়াই ভাল—"

রামকিশোরের নেপথ্যবাসী ভিতরের মনটা তখন বাহিরের মনের টুঁটি চাপিয়া ধরিয়াছে।

হতবাক্ রামকিশোর তাঁহার একমাত্র কন্যার মুখের দিকে অসহায়-ভাবে চাহিয়া রহিলেন।

সরোজিনী জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি তুমি বলেছ, বাবা ?"

সুলেখার ক্রন্দন

সুলেখা কাঁদিতেছে।

গভীর রাত্রি—বাহিরে জ্যোৎস্নায় ফিনিক্ ফুটিতেছে। এই স্বপ্নময় আবেষ্টনীর মধ্যে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় উপুড় হইয়া শুইয়া ষোড়শী তন্বী সুলেখা অঝোরে কাঁদিতেছে। একা!—ঘরে আর কেহ নাই। চুরি করিয়া এক ফালি জ্যোৎস্না জানালা দিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। প্রবেশ করিয়া এই ব্যথাতুরা অশ্রুমুখী রূপসীকে দেখিয়া সে যেন থমকিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কেন এ ক্রন্দন ?

প্রেম ? হইতে পারে বই কি ? এই জ্যোৎস্না-পুলকিতা যামিনীতে সুন্দরী ষোড়শীর নয়ন-পল্লবে অশ্রুসঞ্চারের কারণ প্রেম হইতে

পারে। সুলেখার জীবনে প্রেম একবার আসি-আসি করিয়াছিল ত! তখনও তাহার বিবাহ হয় নাই। অরুণ দা নামক যুবকটিকে সে মনে মনে শ্রদ্ধা করিত। অতীব সঙ্গোপনে এবং মনে মনে। এই শ্রদ্ধাই স্বাভাবিকনিয়মে প্রেমে পরিণত হইতে পারিত—কিন্তু সামাজিক নিয়ম তাহাতে বাধা দিল। সামাজিক নিয়ম অনুসারে অরুণ-দা নয়, বিপিন নামক জনৈক ব্যক্তির লোমশ গলদেশে সুলেখা বরমাল্য অর্পণ করিল!

হয়ত এই গভীর রাত্রিতে জ্যোৎস্নার আবেশে সেই অরুণ-দা'কেই তাহার বার-বার মনে পড়িতেছে। নির্জ্জন শয্যায় তাহারই স্মরণে হয়ত এই অশ্রু-তর্পণ! তবে ইহাও ঠিক যে, তাহার গোপন হৃদয়ের ভীরু বার্ত্তাটি সে অরুণ-দা'কে কখনও জানায় নাই। মনে মনে তাহার যে আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছিল, বিবাহের পর তাহা ধীরে ধীরে কালের অমোঘ নিয়মানুসারে আপনিই নিবিয়া গিয়াছে।

বিপিন যদিও অরুণ-দা নয় কিন্তু বিপিন,—বিপিন।—একেবারে খাঁটি বিপিন! এবং আশ্চর্য্যের বিষয় হইলেও ইহা সত্য কথা যে, বিপিনের বিপিনত্বকে সুলেখা ভালও বাসিয়াছিল। ভালবাসিয়া সুখীও হইয়াছিল। সহসা আজ নিশীথে সেই বিস্মৃত-প্রায় অরুণ-দা'কে মনে পড়িয়া আঁখিপল্লব সজল হইয়া উঠিবে, সুলেখার মন কি এতটা অতীত-প্রবণ?

হইতে পারে। নারীর মন বিচিত্র। তাহাদের মনস্তত্ত্বও অদ্ভুত! সে সম্বন্ধে চট্ করিয়া কোন মন্তব্য করা উচিত মনে করি না! বস্তুতঃ স্ত্রী-জাতির সম্বন্ধে কোন কিছু মন্তব্য করাই দুঃসাহসের কার্য্য। যে রমণীকে দেখিয়া মনে হয় বয়স বোধ হয় উনিশ কুড়ি—অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে তাহার বয়স পঁয়ত্রিশ। এতদনুসারে সাবধানতা অবলম্বন করিয়া পুনরায় কাহারও বয়স যখন অনুমান করিলাম পঁচিশ

—প্রমাণিত হইয়া গেল তাহার বয়ঃক্রম পনর বৎসরের এক মিনিটও অধিক নয়।

সুতরাং নারী-সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে বেকুবের মত ফস্ করিয়া কিছু-একটা বলিয়া বসা ঠিক নয়। সর্ব্বদাই ভদ্রভাবে ইতস্ততঃ করা সঙ্গত। ইহাই সার বুঝিয়াছি এবং সেই জন্যই সুলেখার ক্রন্দন সম্বন্ধে সহসা কিছু বলিব না। কারণ আমি জানি না। এই ক্রন্দনের শোভন ও সঙ্গত কারণ যতগুলি হওয়া সম্ভব তাহাই বিবৃত করিতেছি।

গভীর রাত্রে একা ঘরে একটি যুবতী শয্যায় শুইয়া ক্রমাগত কাঁদিয়া চলিয়াছে—ইহা একটি ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদের বিষয়ও হইতে পারে। কিন্তু আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি, তাহা নয়। পাঠক-পাঠিকাগণ এ-বিষয়ে অন্তত নিশ্চিন্ত হউন। বিপিন এবং সুলেখাকে যত দূর জানি তাহাতে তাহাদের ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা হইবার মত যোগ্যতা আছে বলিয়া মনে হয় না।

অরুণ-দা'র কথা ছাড়িয়া দিলে সুলেখার ক্রন্দনের আর একটি সম্ভাবনার কথা মনে হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে সুলেখার একটি সন্তান হইয়াছিল। তাহার প্রথম সন্তান। সেটি হঠাৎ মাস-দুই পূর্ব্বে ডিপথিরিয়াতে মারা গিয়াছে। হইতে পারে সেই শিশুর মুখখানি সুলেখার জননী হৃদয়কে কাঁদাইতেছে। শিশুটির মৃত্যুর পর সুলেখার দুই দিন 'ফিট্' হয়—ইহা ত আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানি। চিরকালের জন্য যাহা হারাইয়া গিয়াছে তাহাকে ক্ষণিকের জন্যও ফিরিয়া পাইবার আকুলতা কঠোর পুরুষের মনেও মাঝে মাঝে হয়। কোমল হৃদয়া রমণীর অন্তঃকরণে তাহা হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। ক্রন্দনের কারণ পুত্রশোক হইতে পারে। অবশ্যই হইতে পারে।

কিন্তু হ্যাঁ,—আর একটা কারণও ত হইতে পারে! পুত্রশোক-

প্রসঙ্গের পর এই কথাটি বলিতেছি বলিয়া আমাকে আপনারা ক্ষমা করুন—কিন্তু সুলেখার ক্রন্দনের এই তুচ্ছ সম্ভাবনাটা আমি উপেক্ষা করিতে পারিলাম না! বিগত কয়েক দিবস হইতে এক নামজাদা ছবি স্থানীয় সিনেমা হাউসে দেখান হইতেছে। পাড়ার যাবতীয় নর-নারী সদলবলে গিয়া ছবিটি দেখিয়া আসিয়াছেন এবং উচ্ছ্বসিত হইয়া প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করিতেছেন। কিন্তু বিপিন লোকটি এমনই বেরসিক যে, সুলেখার বারম্বার অনুরোধ সত্ত্বেও সে সুলেখাকে উক্ত ছবি দেখাইতে লইয়া যায় নাই। প্রাঞ্জল ভাষায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। সুলেখার যাহা ভাল লাগে প্রায়ই দেখা যায় বিপিনের তাহাতে রাগ হয়। আশ্চর্য্য লোক এই বিপিন! কিছুক্ষণ আগেই সিনেমার "লাস্‌ট শো" হইয়া গিয়াছে। সুলেখার শয়নঘরের বাতায়নের নীচে দিয়াই সিনেমাতে যাইবার পথ। দর্শকের দল খানিকক্ষণ আগেই এই রাস্তা দিয়া সোল্লাসে হল্লা করিতে করিতে বাড়ী ফিরিল। হয়ত তাহাতেই সুলেখার সিনেমা শোক উথলিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে একা কেন? বিপিন কোথায়! সে কি বেগতিক দেখিয়া এই গভীর রাত্রেই কল্যকার জন্য "সিট্‌ বুক" করিতে গিয়াছে?

হইতে পারে! তরুণী পত্নীকে শান্ত করিবার জন্য মানুষ সব করিতে পারে। হোক্ না বিপিন লোমশ—সে মানুষ ত! তাহা ছাড়া বিপিন সুলেখাকে সত্যই ভালবাসিত—ইহাও আমরা বিশ্বস্ত-সূত্রে অবগত আছি। কারণ আমরা—লেখকরা—অনেক কথাই বিশ্বস্তসূত্রে অবগত থাকি। সুতরাং এই ক্রন্দন সিনেমা-ঘটিত হওয়াও কিছুমাত্র অসম্ভব নহে।

সবই হওয়া সম্ভব! বাস্তবিক যতই ভাবিতেছি ততই আমার বিশ্বাস হইতেছে সুলেখার ক্রন্দনের হেতু সবই হইতে পারে। এমন

কি আজই সন্ধ্যাকালে সামান্য একটা কাপড়ের পাড় পছন্দ-করা প্রসঙ্গে সুলেখার সহিত বিপিনের সাংঘাতিক মতভেদ হইয়া গিয়াছে। রূঢ়ভাষী পুরুষ-মানুষেরা সাধারণতঃ যাহা করে বিপিন তাহাই করিয়াছে। গলার জোরে অর্থাৎ চীৎকার করিয়া জিতিয়াছে! মৃদু-ভাষিণী তরুণীগণ সাধারণতঃ যে উপায়ে জিতিয়া থাকেন সুলেখা সম্ভবতঃ তাহাই অবলম্বন করিয়াছে—অর্থাৎ কাঁদিতেছে!

কারণ যাহাই হউক ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে করুণ! রাত্রি গভীর এবং জ্যোৎস্না মনোহারিণী হওয়াতে আরও করুণ,—অর্থাৎ করুণতর! কোন সহৃদয় পাঠক কিংবা পাঠিকা যদি ইহাকে করুণতমও বলেন তাহা হইলেও আমার প্রতিবাদ করিবার কিছু থাকিবে না। কারণ সুলেখা তরুণী। রাত্রি যতই নিবিড় এবং জ্যোৎস্না যতই আকাশ-প্লাবিনী হউক না কেন এ-বিষয়ে খুব সম্ভবতঃ আমরা একমত যে এই রাত-দুপুরে একটা বালক কিংবা একটা বুড়ী কাঁদিলে আমরা এতটা আর্দ্র হইতাম না। উপরন্তু হয়ত বিরক্তই হইতাম।

সুলেখা কিন্তু তরুণী। মন সুতরাং দ্রব হইয়াছে এবং একথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, সুলেখার ক্রন্দনের কারণ না-নির্ণয় করা পর্য্যন্ত স্বস্তি পাইতেছি না। এমন কি অরুণ-দা'কে জড়াইয়া একটা সস্তা-গোছের কাব্য করিতেও মন উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। মন বলিতেছে, "কেন নয়? এমন চাঁদনী-রাতে কৈশোরের সেই অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত প্রণয়-প্রসূত সহসা পূর্ণ-প্রস্ফুটিত হইতে পারে নাকি? ওই ত দূরে 'চোখ গেল' পাখী অশ্রান্ত সুরে ডাকিয়া চলিয়াছে! সম্মুখের বাগানে রজনীগন্ধাগুলি স্বপ্ন-বিহ্বল—চতুর্দ্দিকে জোৎস্নার পাথার! এমন দুর্লভক্ষণে অরুণ-দা'র কথা মনে হওয়া কি অসম্ভব, না অপরাধ?" মনের বক্তৃতা বন্ধ করিয়া কপাটটা হঠাৎ খুলিয়া গেল।

ব্যস্ত সমস্ত বিপিন প্রবেশ করিল। মুখে শঙ্কার ছায়া। সিনেমার টিকিট পায় নাই সম্ভবতঃ। কিন্তু এ কি!

বিপিন জিজ্ঞাসা করিল—"দাঁতের ব্যথাটা কমেছে?"

"না! বড্ড কন্‌কন্ করছে।"

"এই পুরিয়াটা খাও তাহ'লে। ডাক্তার বাবু কাল সকালে আসবেন বললেন। কেঁদে আর কি হবে! এটা খেলেই সেরে যাবে। খাও লক্ষ্মীটি!—"

জোৎস্নার টুক্‌রাটি মুচকি মুচকি হাসিতেছে!

দেখিলেন ত? বলিয়াছিলাম—সবই সম্ভব!

বুধ্‌নী

১

জীবনের সহিত যদি প্রদীপের উপমাটা দেওয়া যায় তাহা হইলে বিল্‌টুর জীবন-প্রদীপের তৈল নিঃশেষপ্রায় হইয়াছে—একথা কিছুতেই বলা চলিবে না। কারণ বিল্‌টুর জীবন-প্রদীপে তৈল পূরাই আছে, সলিতাও ঠিক আছে, শিখাও উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতেছে। কিন্তু সে শিখা নিবিবে। একটি সবল ফুৎকারে তাহাকে নিবাইয়া দেওয়া হইবে। কাল তাহার ফাঁসি!

সে দোষী কি নির্দ্দোষ সে আলোচনা আমাদের অধিকারের বহির্ভূত। আইনের চক্ষে সে দোষী প্রমাণিত হইয়াছে এবং সমাজের মঙ্গলার্থে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইতেছে। হয়ত তাহাকে লইয়া

মাথাই ঘামাইতাম না, যদি সেদিন জেলখানায় বেড়াইতে গিয়া তাহার আর্ত্ত-করুণ চীৎকার না শুনিতাম।

"বুধ্‌নী—বুধ্‌নী—বুধ্‌নী—বুধ্‌নী—বুধ্‌নী।" ভীত মিনতিভরা কণ্ঠে সে ক্রমাগত চেঁচাইয়া চলিয়াছে। বুধ্‌নী তাহার স্ত্রীর নাম।

২

হাজারীবাগের পার্ব্বত্য প্রদেশে ইহাদের বাস। এই পার্ব্বত্য পল্লীতেই একদা ধনুকধারী বিল্‌টু শিকার সন্ধান করিতে করিতে বুধ্‌নীর দেখা পায় এক মহুয়া গাছের তলায়। নিকষ-কৃষ্ণাঙ্গী কিশোরী বুধ্‌নী। সভ্য কোন যুবক আলো-ছায়া খচিত মহুয়া তরুতলে কোন কিশোরীকে দেখিলে যে ঔদাসীন্য ভরে চলিয়া যাইত, বিল্‌টু তাহা করে নাই। বন্য পশুর মত সে তাহাকে তাড়া করিয়াছিল। ত্রস্ত হরিণীর মত দ্রুতবেগে পলায়ন করিয়া বুধ্‌নী নিস্তার পায়। তখনকার মত নিস্তার পাইল বটে কিন্তু বিল্‌টু তাহাকে স্বস্তি দিল না। অসভ্যটা তাহাকে দেখিলেই তাড়া করিত।

৩

তাহার পর সেই বাঞ্ছিত দিবস আসিল।

ইহাদের মধ্যে বিবাহের এক বিচিত্র প্রথা প্রচলিত ছিল। মাঝে মাঝে প্রভাতে বিস্তীর্ণ মাঠে ইহাদের সভা বসিত। সেই সভায় কুমার এবং কুমারীগণের সমাগম হইত। একটা পাত্রে খানিকটা সিঁদূর গোলা থাকিত। কোন অবিবাহিত যুবক কোন কুমারীর পাণিপ্রার্থী হইলে তাহাকে সেই কুমারীর কপালে ওই সিঁদূর লাগাইয়া দিতে হইত। সিঁদূর লাগাইলেই কিন্তু যুবকের প্রাণ-সংশয়। সেই কুমারীর আত্মীয়স্বজন তৎক্ষণাৎ ধনুর্ব্বাণ, সড়্‌কি, বল্লম লইয়া যুবাকে তাড়া করিবে এবং যুবা

যদি আত্মরক্ষা করিতে না পারে—মৃত্যু সুনিশ্চিত। কিন্তু সে যদি সমস্তদিন আত্মরক্ষা করিতে পারে তাহা হইলে সূর্য্যাস্তের পর আত্মীয়-স্বজনেরা মহা আনন্দে মাদল বাঁশী বাজাইয়া কলরব করিতে করিতে কন্যাকে বরের গৃহে পৌঁছাইয়া দিবে।

এই শক্তি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিল্‌টু বুধ্‌নীকে জয় করিয়াছিল। এই ত সেদিনের কথা। এখনও দুই বৎসর পূরা হয় নাই।

৪

অসভ্য বিল্‌টু জংলি বুধ্‌নীকে পাইয়া কি ভাষায় কোন্ ভঙ্গীতে তাহার প্রণয় প্রকাশ করিয়াছিল তাহা আমি জানি না। কল্পনা করাও আমার পক্ষে শক্ত। আমি ড্রইংরুম-বিহারী সভ্য লোক, বর্ব্বর বন্য-দম্পতীর আদবকায়দা আমার জানা নাই! যাহারা গুহা-নিবাসী সুপ্ত শার্দ্দুলকে ভল্লের আঘাতে হনন করে, মৃগের সঙ্গে ছুটিয়া পাল্লা দেয়, উত্তুঙ্গ পাহাড়ে অহরহ অবলীলাক্রমে ওঠে নামে, পূর্ণিমা নিশীথে মহুয়ার মদে আনন্দের স্রোত বহাইয়া দেয়—তাহাদের প্রণয়লীলা কল্পনা করার দুঃসাহস আমার নাই।

শুধু এইটুকু জানি বিবাহের পর বিলটু বুধ্‌নীকে একদণ্ড ছাড়ে নাই! এক দণ্ডও নয়! বনে জঙ্গলে পর্ব্বতে গুহায় এই বর্ব্বর-দম্পতী অর্দ্ধনগ্ন দেহে অবিচ্ছিন্ন ভাবে বিচরণ করিয়া বেড়াইত। বুধ্‌নীর খোঁপায় টকটকে লাল পলাশ ফুল—বিল্‌টুর হাতে বাঁশের বাঁশী—এই সম্বল!

৫

সহসা একটা বিপর্য্যয় ঘটিয়া গেল !

বুধ্‌নী এক সন্তান প্রসব করিল। অসহায় ক্ষুদ্র এক মানবশিশু ! বুধ্‌নীর সে কি আনন্দ ! বর্ব্বর জননীরও মাতৃত্ব আছে, তাহারও অন্তরের সন্তান-লিপ্সা স্নেহময়ী জননীর কল্যাণী মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। নারীত্বের ধাপে পা রাখিয়া বুধ্‌নী মাতৃত্বলোকে উত্তীর্ণ হইয়া গেল ! বিল্‌টু দেখিল—একি। বুধ্‌নীকে দখল করিয়া বসিয়াছে এই শিশুটা ! বুধ্‌নী ত তাহার আর একার নাই ! অসহ্য !

৬

বিলটুর ফাঁসি দেখিতে গিয়াছিলাম। সে মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত চীৎকার করিয়া গেল—বুধ্‌নী—বুধ্‌নী—বুধ্‌নী—বুধ্‌নী। ভগবানের নামটা পর্য্যন্ত করিল না।

নৃশংস শিশু-হত্যাকারীর প্রতি কাহারও সহানুভূতি হইল না !

মানুষের মন

নরেশ ও পরেশ। দুইজনে সহোদর ভাই। কিন্তু এক বৃন্তে দুইটি ফুল—এ উপমা ইহাদের সম্বন্ধে খাটে না। আকৃতি ও প্রকৃতি—উভয় দিক দিয়াই ইহাদের মিলের অপেক্ষা অমিলই বেশী। নরেশের চেহারার মোটামুটি বর্ণনাটা এইরূপ—শ্যাম বর্ণ, দীর্ঘ দেহ, খোঁচা খোঁচা চিরুণী সম্পর্ক বিরহিত চুল, গোলাকার মুখ এবং সেই মুখে একজোড়া বুদ্ধিদীপ্ত চক্ষু, একজোড়া নেউলের লেজের মত পুষ্ট গোঁফ এবং একটি সূক্ষ্মাগ্র শুকচঞ্চু নাসা।

পরেশ খর্ব্বাকৃতি, ফরসা, মাথার কোঁকড়ান কেশদাম বাবরি আকারে সুসজ্জিত। মুখটি একটু লম্বা-গোছের, নাকটি থ্যাবড়া। চক্ষু দুইটিতে কেমন যেন একটা তন্ময় ভাব। গোঁফদাড়ি কামানো। গলায় কণ্ঠি। কপালে চন্দন।

মনের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, দুইজনেই গোঁড়া। একজন গোঁড়া বৈজ্ঞানিক এবং আর একজন গোঁড়া বৈষ্ণব। অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে নরেশ জ্ঞানমার্গ এবং পরেশ ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন।

যখন নরেশের কম্‌বাইন্‌ড হ্যাণ্ড' চাকর নরেশের জন্য 'ফাউল কাট্‌লেট' বানাইতে ব্যস্ত এবং নরেশ 'থিওরি অফ্ রিলেটিভিটি' লইয়া উন্মত্ত তখন সেই একই বাড়ীতে পরেশ স্বপাক নিরামিষ আহার করিয়া যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে মগ্ন। ইহা প্রায়ই দেখা যাইত।

তাই বলিয়া ভাবিবেন না যে, উভয়ে সর্ব্বদা লাঠালাঠি করিতেন; মোটেই তা নয়। ইহাদের কলহ মোটেই নাই। তাহার সুস্পষ্ট

কারণ বোধ হয় এই যে, অর্থের দিক দিয়া কেহ কাহারও মুখাপেক্ষী নন।

উভয়েই এম্-এ পাস—নরেশ কেমিষ্ট্রিতে এবং পরেশ সংস্কৃতে। উভয়েই কলেজের প্রোফেসারি করিয়া মোটা বেতন পান। মরিবার পূর্ব্বে পিতা দুইজনকেই সমান ভাগে নগদ টাকাও কিছু দিয়া গিয়াছিলেন। যে বাড়ীতে ইঁহারা বাস করিতেছেন—ইহাও পৈতৃক সম্পত্তি। বাড়ীটি বেশ বড়। এত বড় যে, ইহাতে দুইতিনটি পরিবার পুত্র-পৌত্রাদি লইয়া বেশ স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে। কিন্তু নরেশ এবং পরেশ দুইজনেই পরিবারহীন। নরেশ বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহের কিছুদিন পরেই পত্নী ইহলোক ত্যাগ করাতে তাঁহার এবং পরেশের মনে পৃথিবীর অনিত্যতা সম্বন্ধে এমন একটা উপলব্ধি আসিল যে, কেহই আর বিবাহ করিলেন না। পরেশ ভাবিলেন—'কা তব কান্তা'—ইহাই সত্য। 'রিলেটিভিটির ছাত্র নরেশ ভাবিতে লাগিলেন··· নির্ম্মলা সত্যই কি মরিয়াছে? আমি দেখিতে পাইতেছি না—এইমাত্র!

সুতরাং নরেশ এবং পরেশ সহোদর হওয়া সত্ত্বেও ভিন্ন প্রকৃতির এবং ভিন্ন প্রকৃতির হওয়া সত্ত্বেও একই বাড়ীতে শান্তিতে বাস করেন।

এক বিষয়ে কিন্তু উভয়ের মিলও ছিল।

পল্টুকে উভয়ে ভালবাসিতেন। পল্টু তপেশের পুত্র। নরেশ এবং পরেশের ছোট ভাই তপেশ। এলাহাবাদে চাকুরি করিত। হঠাৎ এক-দিন কলেরা হইয়া তপেশ এবং তপেশের পত্নী মনোরমা মারা গেল। টেলিগ্রামে আহূত নরেশ এবং পরেশ গিয়া তাহাদের শেষ কথাগুলিমাত্র

শুনিবার অবসর পাইলেন। তাহার মর্ম্ম এই—"আমরা চল্‌লাম। পণ্টুকে তোমরা দেখো।" পণ্টুকে লইয়া নরেশ এবং পরেশ কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন। তপেশের অংশে পৈতৃক কিছু টাকা ছিল। নরেশ তাহার অর্দ্ধাংশ পরেশের সন্তোষার্থে রামকৃষ্ণ মিশনে দিবার প্রস্তাব করিবামাত্রই পরেশ বলিলেন—"বাকী অর্দ্ধেকটা তাহলে বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে খরচ হোক্।" তাহাই হইল। পণ্টুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহারা ভাবিলেন যে, তাঁহারা নিজেরা যখন কেহই সংসারী নহেন তখন পণ্টুর আর ভাবনা কি ?

পণ্টু, নরেশ এবং পরেশ উভয়েরই নয়নের মণিরূপে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। নরেশ কিম্বা পরেশ কেহই নিজের মতবাদ পণ্টুর উপর ফলাইতে যাইতেন না। পণ্টুর যখন যাহা অভিরুচি সে তাহাই করিত। নরেশের সঙ্গে আহার করিতে করিতে যখন তাহার মুর্গী সম্বন্ধে মোহ কাটিয়া আসিত তখন সে পরেশের হবিষ্যান্নের দিকে কিছুদিন ঝুঁকিত! কয়েকদিন হবিষ্যান্ন ভোজনের পর আবার আমিষ-লোলুপতা জাগিলে নরেশের ভোজনশালায় ফিরিয়া যাইতেও তাহার বাধিত না।

নরেশ এবং পরেশ উভয়েই তাহাকে কোন নির্দ্দিষ্ট বাঁধনে বাঁধিতে চাহিতেন না—যদিও দুইজনেই মনে মনে আশা করিতেন যে বড় হইয়া পণ্টু তাঁহার আদর্শকেই বরণ করিবে।

পণ্টুর বয়স ষোল বৎসর। এইবার ম্যাট্রিক দিবে। সুন্দর স্বাস্থ্য—ধপধপে ফরসা গায়ের রঙ্—আয়ত চক্ষু। নরেশ এবং পরেশ দুইজনেই সর্ব্বান্তঃকরণে পণ্টুকে ভালবাসিতেন। এ-বিষয়ে উভয়ের কিছুমাত্র অমিল ছিল না।

এই পণ্টু একদিন অসুখে পড়িল।

নরেশ এবং পরেশ চিন্তিত হইলেন। নরেশ বৈজ্ঞানিক মানুষ, তিনি স্বভাবতঃই একজন এলোপ্যাথিক ডাক্তার লইয়া আসিলেন। পরেশ প্রথমটায় কিছু আপত্তি করেন নাই, কিন্তু যখন উপর্য্যুপরি সাত দিন কাটিয়া গেল, জ্বর ছাড়িল না তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। নরেশকে বলিলেন—"আমার মনে হয় একজন ভাল কবিরাজ ডেকে দেখালে কেমন হ'ত?"

"বেশ দেখাও—"

কবিরাজ আসিলেন—সাত দিন চিকিৎসা করিলেন। জ্বর কমিল না, বরং বাড়িল। পল্টু প্রলাপ বকিতে লাগিল। অস্থির পরেশ তখন নরেশকে বলিলেন, "আচ্ছা, একজন জ্যোতিষীকে ডেকে ওর কুষ্টিটা দেখালে কেমন হয়? কি বল?"

"বেশ ত। তবে তাই কর, এ জ্বর একুশ দিনের আগে কমবে না। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন—টাইফয়েড।"

"তাই না কি?"

পল্টুর কোষ্ঠি লইয়া ব্যাকুল পরেশ জ্যোতিষীর বাড়ী ছুটিলেন। জ্যোতিষী কহিলেন—"মঙ্গল মারকেশ। তিনি রুষ্ট হইয়াছেন।" কি করিলে তিনি শান্ত হইবেন, তাহার একটা ফর্দ্দ দিলেন। পরেশ প্রবাল কিনিয়া পল্টুর হাতে বাঁধিয়া মঙ্গলের শান্তির জন্য শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাদি করিতে লাগিলেন।

অসুখ কিন্তু উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। নরেশ একদিন বলিলেন—"কবিরাজি ওষুধেত বিশেষ উপকার হচ্ছে না, ডাক্তারকেই আবার ডাকব না কি?"

"তাই ডাক না হয়—"

নরেশ ডাক্তার ডাকিতে গেলেন। পরেশ পল্টুর মাথার শিয়রে

বসিয়া মাথায় জলপটি দিতে লাগিলেন। পল্টু প্রলাপ বকিতেছে—"মা আমাকে নিয়ে যাও। বাবা কোথায়।"

আতঙ্কে পরেশের বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, তারকেশ্বরে গিয়া ধর্না দিলে শুনিয়াছি দৈব ঔষধ পাওয়া যায়। ঠিক।

নরেশ ফিরিয়া আসিতেই পরেশ বলিলেন—"আমি একবার তারকেশ্বর চল্লাম ফিরতে দু-এক দিন দেরী হবে।"

"হঠাৎ তারকেশ্বর কেন?"

"বাবার কাছে ধর্না দেব—"

নরেশ কিছু বলিলেন না। ব্যস্তসমস্ত পরেশ বাহির হইয়া গেলেন। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"বড় খারাপ টার্ণ' নিয়েছে।

ডাক্তারি চিকিৎসা চলিতে লাগিল।

দিন দুই পরে পরেশ ফিরিলেন। হস্তে একটি মাটির ভাঁড়। উল্লসিত হইয়া তিনি বলিলেন—"বাবার স্বপ্নাদেশ পেলাম। তিনি বললেন যে রোগীকে যেন ইন্‌জেক্‌শন দেওয়া না হয়। আর বললেন, এই চরণামৃত রোজ একবার করে খাইয়ে দিতে, তাহলেই সেরে যাবে।"

ডাক্তারবাবু আপত্তি করিলেন। নরেশও আপত্তি করিলেন। টাইফয়েড রোগীকে ফুলবেলপাতা পচা জল কিছুতেই খাওয়ান চলিতে পারে না।

হতবুদ্ধি পরেশ ভাণ্ডহস্তে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

আসলে কিন্তু ব্যাপার দাঁড়াইল অন্যরূপ। পরেশের অগোচরে পল্টুকে ডাক্তারবাবু যথাবিধি ইন্‌জেক্‌শন দিতে লাগিলেন এবং ইহাদের অগোচরে পরেশ লুকাইয়া পল্টুকে প্রত্যহ একটু চরণামৃত পান করাইতে লাগিলেন।

কয়েকদিন চলিল। রোগের কিন্তু উপশম নাই

গভীর রাত্রি। হঠাৎ নরেশ পাশের ঘরে গিয়া পরেশকে জাগাইলেন। "ডাক্তারবাবুকে একবার খবর দেওয়া দরকার, পল্টু কেমন যেন করছে"

"অ্যাঁ, বল কি?"

পল্টুর তখন শ্বাস উঠিয়াছে।

উন্মাদের মত পরেশ ছুটিয়া নীচে নামিয়া গেলেন ডাক্তারকে 'ফোন' করিতে। তাঁহার গলার স্বর শোনা যাইতে লাগিল—

"হ্যালো—শুনছেন ডাক্তারবাবু, হ্যালো—হাঁ, হাঁ, আমার আর ইনজেক্‌শন দিতে আপত্তি নেই—বুঝলেন—হ্যালো—বুঝলেন—আপত্তি নেই—আপনি ইনজেক্‌শন নিয়ে শিগ্‌গির আসুন—আমার আপত্তি নেই, বুঝলেন—"

এদিকে নরেশ পাগলের মত চরণামৃতের ভাড়টা পাড়িয়া, চামচে করিয়া খানিকটা চরণামৃত লইয়া পল্টুকে সাধ্যসাধনা করিতেছেন—"পল্টু খাও—খাও ত বাবা—একবার খেয়ে নাও একটু—"

তাঁহার হাত থর থর করিয়া কাঁপিতেছে চরণামৃত কস বাহিয়া পড়িয়া গেল।

শেষ